দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমি ও প্রকৃতি

ভূপ্রাকৃতিক পরিচয়

মুর্শিদাবাদ নিম্ন গঙ্গা-সমভূমির অন্তর্গত প্রেন্সিডেন্সি বিভাগের উত্তর দিকের একটি জেলা। এই জেলার ভাগীরথীর পূর্বপাড়ের অংশ আবার মুমূর্ষু বা মৃতপ্রায় গঙ্গা ব-দ্বীপের অংশ বিশেষ।

মুর্শিদাবাদ জেলার আকৃতি অনেকটা সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের মতো। যার শীর্ষবিন্দু একেবারে উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থান করছে। এই জেলার পশ্চিম সীমা ঝাড়খন্ডের সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলা দ্বারা চিহ্নি(ত। উত্তর ও উত্তর-পূর্বে রয়েছে গঙ্গা ও পদ্মা, পূর্বে রয়েছে বাংলাদেশের রাজশাহী, দ(িণে রয়েছে নদীয়া ও বর্ধমান জেলা এবং দ(িণ-পূর্বে রয়েছে জলঙ্গী নদী। ঝাড়খন্ডের সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম বা বর্ধমান জেলার সঙ্গে কোন প্রাকৃতিক সীমা নেই। তবে বর্তমানে গঙ্গার প্রধান প্রবাহপথ জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের সীমানা নির্দেশ করে এবং মালদহ ও রাজশাহী জেলা থেকে মুর্শিদাবাদকে পৃথক করে। অন্যদিকে জলঙ্গী নদীকে বলা যায় মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার সীমারেখা।

ভাগীরথী নদী এই জেলার উত্তর থেকে দ(িণে প্রবাহিত হয়েছে। ভাগীরথীর জল বিভাজন রেখা জেলার ভূখন্ডটিকে প্রায় সমান দুটি ভাগে ভাগ করেছে। ভাগীরথীর পশ্চিম অংশের নাম 'রাঢ়' । পূর্ব দিকের অংশটি 'বাগড়ী' নামে পরিচিত।

মুর্শিদাবাদের রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। রাঢ় দেশ অতি প্রাচীন— মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলও অতি প্রাচীন দেশ এবং সুদীর্ঘকাল থেকে রাঢ় বা রাঢ়া নামে পরিচিত। রাঢ় শব্দটি লাঢ় বা লাঢ়া শব্দ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। কারণ খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত জৈন 'ভগবতী সূত্রে' ভারতবর্ষে ষোড়শ জনপদের মধ্যে লাঢ় (বা লাঢ়া) জনপদের উল্লেখ আছে। জৈন সূত্র অনুসারে রাঢ় বঙ্গদেশের প্রাচীনতম জনপদ।

অন্যদিকে বাগড়ী শব্দটির উৎস হিসাবে ব্যাঘ্রতটি বা বত্র(দ্বীপ শব্দকে নির্দেশ করা হয়। পদ্মা-ভাগীরথীর মধ্যবর্তী জলা-জঙ্গলপূর্ণ ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চলের স্মৃতি ব্যাঘ্রতটিতে র(িত। আর ত্রিভূজাকৃতি ব-দ্বীপটি বত্র(দ্বীপ > বাগড়ী নামে পরিচিত। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য 'বাল-বলভী' শব্দ থেকে বাগড়ীর উদ্ভব নির্দেশ করেছেন। ঐ অঞ্চলটি গঙ্গা ও পদ্মার মাঝখানে, যার আকৃতি 'ব' -এর মতো। তার দ(িণ দিকটা প্রায় জঙ্গল — সুন্দরবন। উত্তর দিকে মানুষের বাস। 'হরিবর্মদেব ঐ দেশ জয় করে ভবদেব ভট্টকে শাসক নিযুক্ত(করেছিলেন।' এই জন্য ভবদেবের উপাধি হয়েছে 'বাল-বলভি-ভূজঙ্গ' অথবা বাগড়ীর রাজা।

রাঢ় ও বাগড়ী, এই দুই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, কৃষি এমনকি অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তাই জেলার ভূ-খন্ডটিকে একটি অঞ্চল না বলে দুটি পৃথক অঞ্চল বললেই ঠিক হয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অংশটি বর্ধমান , বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি নিয়ে গঠিত রাঢ় অঞ্চলের ত্র(মশ প্রসারিত অংশ। আবার পূর্বের 'বাগড়ী' অঞ্চল নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলের থেকে পৃথক কোন দেশ নয়— গঙ্গা-বদ্বীপের অংশ বিশেষ। এই দুই অঞ্চলের পৃথকীকরণের মূলে রয়েছে ভাগীরথীর প্রবাহ। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ভাগীরথী দিয়েই গঙ্গার মূলস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তখন পদ্মাকে একটি খাল বলা হতো। ভূ-বিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন অতীতে ভাগীরথী গঙ্গার মূলধারা বহন করে সমুদ্রে সমাগত হ'ত। পদ্মা তখন ছিল শীর্ণা। ডঃ টমাস ওল্ডহ্যাম (খ্রীঃ ১৮৭০) লিখেছেন যে, রাজমহলের শৈলশ্রেণীতে প্রতিহত হয়ে গঙ্গা ভাগীরথী - হুগলীর খাতেই প্রবাহিত হ'ত। কালত্র(মে এই খাতের অবনতি ঘটায় গঙ্গার মূলস্রোত পদ্মার খাতকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হতে শু(করে। ডঃ বুকানন হ্যামিলটনের অনুমান, কোশী গঙ্গায় সঙ্গত হবার পর ঋদ্ধ জলধারা ভাগীরথী-হুগলীর খাত ত্যাগ করে পদ্মার বিশালতর খাত খুঁজে নেয়। হেডেন ও প্যাসকো একটি যুগ্ম প্রতিবেদনে বলেছেন গঙ্গার এই খাত পরিবর্তন কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, ব-দ্বীপ গঠন প্রত্রি(য়ায় একটি আনুষঙ্গিক ঘটনা। গাঙ্গেয় নিম্ন-সমভূমি গঠনের পরই গঙ্গাধারার এই পরিবর্তন ঘটেছে। বস্তুত গঙ্গার এই দ্বি-বিভাজন কোন প্রাচীন ঘটনাও নয়। ভাগীরথীর বয়স তাই হয়ত পাঁচ হাজার বছরের বেশী নয়। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ধর্মপাল' শীর্ষক ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসে লিখেছেন যে রাজা গোপালের সময়ে (খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী) গঙ্গাধারা ভাগীরথীর খাত অবলম্বন করেই প্রবাহিত হত।

যাইহোক, যতদিন পর্যন্ত গঙ্গা ভাগীরথীর খাত ধরে প্রবাহিত হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত অঞ্চলের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অঞ্চল দুটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র বা শাসন কেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত(হওয়ায় অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও পার্থক্য ঘটেছে।

তবে চতুর্দশ -পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই গঙ্গার মূল স্রোত ভাগীরথীর পথ পরিহার করে বর্তমান পদ্মার খাতে বইতে শু(করে। তখন থেকেই ভাগীরথী ত্র(মশঃ শীর্ণকায়া হতে শু(করে এবং ভাগীরথীর তীরবর্তী দুটি ভূ-ভাগ অর্থাৎ রাঢ় ও বাগড়ী, কেবল নিকটবর্তীই হয়ে ওঠেনি(প্রকৃতপ(একটি অঞ্চলেই পরিণত হয়েছিল।

রাঢ় অঞ্চল ঃ

ভূ প্রাকৃতিক দিক থেকে রাঢ় অঞ্চলটি উপবিন্ধ্যায়ন যুগের বিন্ধ্য পর্বতমালার পূর্বদিকে ল্যাটেরাইটিক কর্দম ও ঘুটিং-এর সম্প্রসারিত অংশ। অঞ্চলটি ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বপ্রান্তে। রাজমহল শৈলশ্রেণীর কঠিন ভূমি ত্র(মশ নীচু হয়ে ভাগীরথীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই উচ্চ ভূমির পূর্বপ্রান্তে মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল। ভাগীরথীর তীরবর্তী একটি সংকীর্ণ অঞ্চল ছাড়া রাঢ়ের বাকী অংশ তরঙ্গায়িত, দৃঢ় কর্দমময়। স্থানে স্থানে জলাভূমি, প্রাচীন পরিত্যক্ত(নদীখাত এবং কঙ্করযুক্ত(লালমাটি দেখা যায়।

জেলার উত্তর প্রান্তে গুমানি নদী, তারপর দ(ি ণে বাগমারী, বাঁশলোই, পাগলা, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ূরা(ী, কোপাই বা কুয়ে প্রভৃতি ছোট ছোট নদীগুলো রাজমহল পাহাড় বা পশ্চিম রাঢ়ের উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভাগীরথীতে মিশে গিয়েছে।

প্রভৃতি ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে এই নদীগুলো ভাগীরথীর উপনদী হলেও এরা ভাগীরথী অপে(া অনেক প্রাচীন।

রাঢ় অঞ্চলটির সর্বাধিক উচ্চতা পশ্চিমে বীরভূম জেলার সীমানায় ল(্য করা যায়। রাঢ় অঞ্চলের পূর্ব সীমান্ত ও স্বল্প উচ্চভূমি উচ্চতার টিলা দ্বারা চিহ্নি(ত করা হয়েছে, যার উচ্চতা ১৫ ফুট থেকে ২০ ফুট।

রাঢ় অঞ্চলকে তিনটি ভূ-প্রাকৃতিক উপবিভাগে ভাগ করা যায়—

১। পদ্মা নদী সংলগ্ন এলাকা (

২। ক) ভাগীরথী - দ্বারকা মধ্যবর্তী অঞ্চল (

খ) রাঙামাটি উচ্চভূমি(

৩। ময়ূরা(ী-দ্বারকা সমভূমি(

১। পদ্মা নদী সংলগ্ন এলাকা ঃ পদ্মা নদী এই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংকীর্ণ এলাকাটি উত্তর থেকে দ(ি ণে ৩২ কিলোমিটার চওড়া। এই অংশটি বিস্তৃত সমভূমি অঞ্চল। এই এলাকার একেবারে উত্তর-পশ্চিম ঘেঁষে একটি নাতি উচ্চ টিলার অবস্থান ল(্য করা যায়, যার নাম বেলপাহাড়ী। এর উচ্চতা ৪২.৬৭ মিটার। এই টিলাটি মহুয়ার জঙ্গলে ঢাকা। পদ্মার ডান পাড়ের উচ্চতা উল্লেখযোগ্য (৬.৭১ মিটার)।

এই অংশে অবস্থিত নিম্নভূমি ও জলাভূমিগুলি পদ্মার গতিপথ পরিবর্তনের সা(ী। রাজমহল পাহাড় থেকে গুমানি, বাঁশলোই, পাগলা প্রভৃতি নদীগুলো এই অংশের ভূমিভাগের ঢাল নির্দেশ করে। গ্রীষ্মকালে এইসব নদীগুলো শীর্ণকায়া হলেও বর্ষায় তারা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

২। ক) ভাগীরথী - দ্বারকা মধ্যবর্তী অঞ্চল ঃ এই বিস্তৃত অঞ্চলটি তরঙ্গায়িত, পূর্বদিকে ঢালযুক্ত(ল্যাটেরাইট বা প্রাচীন পলি দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলটি দ্বারকা, গম্ভীরা, ব্রাহ্মণী এবং ভাগীরথীর বিভিন্ন শাখানদী সমূহ দ্বারা বিধৌত। এই অঞ্চলটির মধ্যভাগ বন্যার দ্বারা মাঝেমাঝেই প্-াবিত হয়। সেকারণে বন্যার জলে আগত পলি সঞ্চয় ঘটে। ফলস্বরূপ মধ্যভাগ দিনকে দিন উঁচু হয়ে ওঠে।

এই অঞ্চলের জলস্তরের গভীরতা ৯.১৪ মিটার থেকে ১২.১৯ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

খ) রাঙামাটি উচ্চভূমি ঃ বাবলা ও ভাগীরথী নদীর মধবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চলটির ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলীতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ভাগীরথীর জলতল থেকে ৯.১৪ মিটার উচ্চ 'ক্লিফ' রয়েছে উইল কক্স যা চুন ও লোহার অক্সাইড যুক্ত(লালচে মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত, অঞ্চলটি রাঙামাটি নামে পরিচিত। কঙ্কর জাতীয় মৃত্তিকা এই অঞ্চলে বি(িপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। অঞ্চলটি আবহবিকার ও নদীর কার্যের ফলে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে।

৩। ময়ূরা(ী-দ্বারকা সমভূমি ঃ এই সমভূমিটি সবুজ বাগিচার মত ধান(েতে ঢাকা। দ্বারকা এই অঞ্চলের দ(িণপূর্ব দিকে বিনুনীর মত জলনির্গম প্রণালী গড়ে তুলেছে। এখানকার নদীগুলো মাঝেমাঝেই গতিপথ পরিবর্তন করে।

হিজল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিমে এই অঞ্চলের মধ্যে যেখানে ময়ূরা(ী ও দ্বারকা নদী পরস্পর মিলিত হয়েছে, সেখানে ১৩০ বর্গকিলোমিটার স্থান জুড়ে সরার মত এক জলাভূমির অবস্থান ল(্য করা যায়, যা হিজল নামে পরিচিত। এই হিজল অঞ্চলে হিজল গাছ ও নলখাগড়া ঘাসেরই প্রাধান্য ল(্য করা যায়। বর্ষার সময় এই অঞ্চলটি জলের তলায় ডুবে থাকে। বিভিন্ন স্থানে এর গভীরতা ৬.১০ মিটার। শীতকালে এখানে বিভিন্ন শস্যের, যেমন-গম, ছোলা, তৈলবীজ, ইত্যাদির চাষ হয়। এছাড়াও

অঞ্চলটি শীতকালে পশুচারণ(ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বাগড়ী অঞ্চল ঃ

ভাগীরথীর পূর্বপাড়ের অঞ্চলকে বাগড়ী বলা হয়। আয়তনে প্রায় রাঢ় অঞ্চলের সমান। গঙ্গা, পদ্মা, ভাগীরথী নদীবাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে বাগড়ী অঞ্চলের সৃষ্টি। এই অঞ্চলটির ভূমি রাঢ় অপে(া নীচু, বেলে বা দোঁয়াশ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত।

এই অঞ্চলের নদীগুলোর মধ্যে ভৈরব-ই প্রধান নদী। ভৈরব জেলার উত্তর-পূর্বে আখেরীগঞ্জ থেকে নির্গত হয়ে নীচের দিকে জলঙ্গীর সাথে যুক্ত(হয়ে জলঙ্গী নামে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করেছে এবং কৃষ(নগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নবদ্বীপের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। এই অঞ্চলের-ই গোবরানালা বা ভান্ডারদহ, সুতী বা ছোটভৈরব, শিয়ালমারী, কলকলি প্রভৃতি এককালের নদীগুলোকে এখন আর প্রকৃত অর্থে নদী বলা যায় না।

বাগড়ী অঞ্চলকে তিনটি ভূ-প্রাকৃতিক উপ এককে ভাগ করা যায়।

১) ভাগীরথী স্বাভাবিক বাঁধ
২) পদ্মা-ভৈরব-ভাগীরথী নদী সংলগ্ন এলাকা
৩) কালান্তর নিম্নভূমি

১) ভাগীরথী স্বাভাবিক বাঁধ ঃ দীর্ঘ ও সংকীর্ণ ভাগীরথী স্বাভাবিক বাঁধ অঞ্চলটি পলি দ্বারা গঠিত বাগড়ী অঞ্চলের অন্যান্য জায়গা থেকে যথেষ্ট পৃথক। এই অঞ্চলের পশ্চিমে রয়েছে ভাগীরথী, পূর্বে রয়েছে গোবরানালা। অঞ্চলটি বারংবার বন্যার জলে প্লাবিত হয়। তাঁর ফলে বহুবছর ধরে বালুকা ও পলি সঞ্চিত হয়ে এখানে স্বাভাবিক বাঁধ সৃষ্টি হয়েছে। এই বাঁধ ৪ কিমি থেকে ৯ কিমি চওড়া। পর্যবে(ণ করে দেখা গেছে মুর্শিদাবাদে এই স্বাভাবিক বাঁধের উচ্চতা ১৯.৫১ মিটার।

এই অঞ্চলটি গোবরানালার দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে। এই গোবরানালা ভাগীরথীর-ই একটি শাখা বলে মনে করা হয়। এই অঞ্চলে নদীর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত অ(্(রাকৃতি হ্রদের নিদর্শন ল(্য করা যায়। যেমন- মতিঝিল, বিষু(পুর বিল, ক্যালকাটা বিল প্রভৃতি। এই সকল অ(্(রাকৃতি হ্রদ সমূহ ভাগীরথী নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ইঙ্গিত প্রদান করে। রেনেলের মতে মতিঝিল ভাগীরথীর একটি পরিত্যক্ত(খাত। অন্যদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগীরথী নদী অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিষু(পুর বিল বরাবর প্রবাহিত ছিল। যা থেকে অনুমান করা যায় বিষু(পুর বিল ভাগীরথীর প্রাচীন পরিত্যক্ত(নদীখাত।

২) পদ্মা-ভৈরব-ভাগীরথী নদী সংলগ্ন এলাকা ঃ এই অঞ্চলটি ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও জলতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে রাঢ় অঞ্চল থেকে পৃথক। বাগড়ী অঞ্চলে অর্ধেকের বেশী স্থান জুড়ে এই উপ-অঞ্চলটি অবস্থান করেছে। পদ্মা ও শাখানদী, যেমন, জলঙ্গী, ভৈরব, ছোট-ভৈরব, শিয়ালমারী দ্বারা বাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, শিয়ালমারী, ভৈরব, ছোট-ভৈরব প্রভৃতি ভাগীরথীর শাখানদীগুলো গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মূলনদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অঞ্চলটির উত্তরাংশে আবার দেখা যায় যে, গ্রীষ্মকালে এই সব নদীখাত একেবারে শুকিয়ে যায় এবং চাষাবাদ চলে। সেকারণে এই শাখানদীগুলোকে বর্তমানে সে অর্থে আর নদী বলা যায় না—বলা হয় পরিত্যক্ত(নদীখাত।

নুরপুরে যেখান থেকে ভাগীরথী নির্গত হয়েছে সেখান থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত অঞ্চলটি বালু-দোঁয়াশ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। অঞ্চলটি ধীরে ধীরে পূর্বদিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে। নদীখাতে অনেক বালুচরের অবস্থান ল(্য করা যায়। ভৈরব এই অঞ্চলকে দুটি ভাগে বিভক্ত(করেছে।

ক। পূর্বদিকের ভৈরব ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী অংশ।

খ। মধ্যভাগে ভান্ডারদহ ও ভৈরবের মধ্যবর্তী অংশ।

ক। পূর্বদিকের ভৈরব ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী অংশ ঃ রাণীনগর ও ডোমকল থানা নিয়ে এই অংশটি গড়ে উঠেছে। অঞ্চলটি অপে(াকৃত নিচু, বিশেষকরে দ(িণ দিকের অংশটি। এই অঞ্চলে বিলের প্রাধান্য দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে নীলের চাষ হত এবং রেশম শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। জিৎপুর ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে জঙ্গলের প্রাধান্য কম ছিল। জলঙ্গী নদী এই অঞ্চলে অনেক বাঁক সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়েছে এবং নওদা থানার বালিগ্রামের কাছে চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়ে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করেছে।

খ। মধ্যভাগে ভান্ডারদহ ও ভৈরবের মধ্যবর্তী অংশ ঃ এই অংশটি পূর্বদিকের অংশ অপে(া অপে(াকৃত উচ্চ । সেকারণে নদী বাহিত পলির দ্বারা পুনরায় উর্বর হবার সুযোগ কম। স্থানে স্থানে বি(িপ্তভাবে জঙ্গলের অবস্থান ল(্য করা যায়। দ(িণে ধীরে ধীরে অঞ্চলটি কালান্তর অঞ্চলের সাথে মিশে গিয়েছে।

৩) কালান্তর নিম্নভূমি ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার দ(িণ- পূর্ব সীমানায় বাগড়ী অঞ্চলের ত্র(মপ্রসারিত অংশ কালান্তর নামে পরিচিত। অঞ্চলটি কালো-কর্দম মৃত্তিকায় গঠিত এবং সরার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটি বিস্তৃত জলাভূমি।

এই অঞ্চলটি জলাভূমি রূপে গড়ে ওঠার কারণ হিসাবে মনে করা হয় যে, ভাগীরথী নদী একসময় 'কালান্তরের' পথ ধরেই সাগরে গিয়ে পড়ত। তারপর ভাগীরথী নদী সরে যাওয়ায় অঞ্চলটি ভাগীরথীর পরিত্যক্ত(খাত হিসাবে থেকে যায়। বর্ষার সময় জল জমে তা সমুদ্রের রূপ নেয় এবং জলাভূমির সৃষ্টি করে। অঞ্চলটি সমুদ্রতল থেকে ১৫.২৪ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

কালান্তর নাম কেন হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন বলা হয়— এই নিম্নভূমিটি এই জেলা পেরিয়ে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করেছে— তাই কালান্তর। এই অঞ্চলটি আসলে এক অনুর্বর কৃষিবিহীন জলাভূমি। কালান্তর শব্দের অর্থ হল 'Outside of the region of the God of death ' সহজ কথায় কালান্তর শব্দের অর্থ হলো মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত(জলাভূমি।

এই অবনত জলাভূমি অঞ্চলটিতে বিভিন্ন মাপের ও গভীরতার বিল রয়েছে। যেমন- শালমারা, পাট, ধান্দার, হর্মা, সইচান্দী, কমরী প্রভৃতি।

ভূমির আপে(ক উচ্চতা, মৃত্তিকা, জলাভূমির অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাগীরথীর পূর্বাঞ্চলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

যথা ঃ- ১। বাগড়ী, ২। কালান্তর, ৩। ভড় এবং ৪। দিয়ার

১। **বাগড়ী ঃ** এই অঞ্চলের কথা আগেই বলা হয়েছে।

২। **কালান্তর** ঃ হরিহরপাড়ার শেষ প্রান্ত থেকে দ(ণে পলাশী পর্যন্ত প্রসারিত ভৈরব ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী নিচু জমিতে বর্ষার জল জমে সমুদ্রের রূপ নেয়। জলনিকাশি ব্যবস্থার অভাবে এ জল দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মাস। এ অঞ্চলের মাটি এঁটেল— এই কালান্তর অঞ্চল।

৩। **ভড় ঃ** বাগড়ী ত্র(মশ নীচু হয়ে পদ্মাকে স্পর্শ করেছে। নরম পলিমাটি যুক্ত(এই অঞ্চলে নদীগুলি বহুবার খাত পরিবর্তন করেছে। তার চিহ্(স্বরূপ বড় বিল, জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাগটি প্রধানত লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

৪। **দিয়ার ঃ** বাগড়ীর মাঝেমাঝে উঁচু সমতল ভূ-খন্ডগুলিকে দিয়ার বলা হয়। যেমন- সাদিখাঁর দিয়ার, পাড় দিয়ার, সাহা দিয়ার, কামুরদিয়ার প্রভৃতি।

ভৌগোলিক দিকে থেকেও বাগড়ী অঞ্চলকে পাঁচটি উপ বিভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ-

১। পৌর অঞ্চল(

২। ভাগীরথী নদী সংলগ্ন এলাকা(

৩। মধ্যভাগে ভান্ডারদহ ও ভৈরবের মধ্যবর্তী অঞ্চল(

৪। পূর্বে ভৈরব ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী অংশ(

৫। কালান্তর অঞ্চল।

ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস

ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা নিম্ন গঙ্গা সমভূমির রাজমহল-মেঘালয় গ্যাপের মধ্যে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় থেকে পূর্বে মেঘালয় মালভূমির মধ্যবর্তী প্রায় ২০০ কিলোমিটার প্রশস্ত সমভূমির পথ ধরেই উত্তর ভারত, নেপাল এবং তিব্বতের সমস্ত বৃষ্টি ও বরফগলা জল ব-দ্বীপে নেমে আসে। ভূ-তাত্ত্বিকেরা রাজমহল ও মেঘালয়ের মধ্যবর্তী এই পথটির নাম দিয়েছেন রাজমহল-মেঘালয় গ্যাপ।

আজ থেকে ৭ কোটি বছর আগে টার্শিয়ারী যুগে হিমালয় ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্ব শু(হয়েছিল। তারপর বিভিন্ন সময়ে ভূ-আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি রেখে হিমালয়ের গঠন কার্য চলতে থাকে। হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল ছিল এক অবনমিত প্রাচীন শিলাস্তর যা 'বেঙ্গল বেসিন' নামে পরিচিত। এই প্রবীন শিলাস্তরের উপর প্রায় ৭০ ল(বছর ধরে পলি সঞ্চয়নের ফলে গঙ্গা ব-দ্বীপের সমভূমি সৃষ্টি হয়েছিল যা মুর্শিদাবাদের পূর্ব অংশে বিদ্যমান। মুর্শিদাবাদের পূর্বের অংশ প্রকৃতপ(ভাগীরথীর খাড়ীয় অংশ। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিমের অংশে রাজমহল ট্র্যাপের শিলাস্তরত্র(ম দেখতে পাওয়া যায়।

ভূ-তাত্ত্বিক বিবর্তন ঃ

মুর্শিদাবাদ জেলা বঙ্গ অববাহিকার একটি অংশ হিসাবে পরিগণিত। এই অববাহিকার গাঠনিক এককের কিছু অংশ মুর্শিদাবাদে দেখা যায়। যেমন —

১) শিল্ড অঞ্চল— যেটি আর্কিয়ান শিল্ড দিয়েই গঠিত। এই অঞ্চলটি চাপা পড়ে আছে গভীর পলল স্তুপের নীচে, যার অবস্থান মুর্শিদাবাদের উত্তর পশ্চিমে ফরাক্কা ব্লকের বেওয়া, শিকারপুর, যাদবপূর্ণিমাতলা, গোবিন্দরামপুর প্রভৃতি গ্রামের অংশ বিশেষে।

২) **সুস্থিত মহিসোপান অঞ্চল** দেখা যায় জলঙ্গী অঞ্চলে।

ভূসংস্থানগত (tectonically) দিক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। **উন্মুক্ত(শিল্ড অঞ্চল** যা মুর্শিদাবাদের কিছু অংশে দেখা যায়।

২। ফরাক্কার স্থানে স্থানে ও সুতি প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে গভীর পলল স্তুপের তলায় ঢাকা পড়া (Buried) শিল্ড অঞ্চল রয়েছে।

৩। এছাড়াও মুর্শিদাবাদের বাকী অংশ **শিল্ড ও জিওসিন - ক্লাইনের সন্ধি অঞ্চল** নামে পরিচিত।

ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে মুর্শিদাবাদ জেলাতে নিম্নলিখিত স্তরত্র(ম দেখা যায় ঃ-

উপযুগের নাম	বয়স	স্তরত্র(ম
সাম্প্রতিক		পলল অব(প
প¬ইস্টোসিন থেকে সাম্প্রতিক	৫০ ল(বছর	প্রাচীন পলল এবং ল্যাটেরাইট ক্লে
জুরাসিক	১৪ কোটি বছর	রাজমহল ট্র্যাপ

জুরাসিক ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকে জুরাসিক যুগের রাজমহল ট্র্যাপের অবস্থান ল(্য করা যায়। জুরাসিক যুগে এই অঞ্চলে অগ্নুৎপাতের ফলে ব্যাসল্টের লাভা প্রবাহ ঘটেছিল। সেই লাভা প্রবাহের উপর আরো অন্যান্য যুগের অব(প সঞ্চিত হয়ে বর্তমান ভূমিরূপ গঠিত হয়েছে। এই রাজমহল ট্র্যাপ কার্বনেসিয়াম শেল ও ক্লে যুক্ত(ব্যাসল্ট লাভা দ্বারা গঠিত।

প¬ইস্টোসিন থেকে সাম্প্রতিক ঃ ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে এই যুগের শিলাস্তরের অবস্থান ল(্য করা যায়। এই অংশটি প্রাচীন যুগের পলল ও ল্যাটেরাইট কর্দম দ্বারা গঠিত। ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ের এই শিলাস্তরত্র(ম উপ-বিন্ধ্যায়ন (Sub Vindhayan) যুগের সম্প্রসারিত অংশ বলে মনে করা হয়।

সাম্প্রতিক ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিকের কিছু অংশ ছাড়া জেলার সর্বত্র সাম্প্রতিক যুগের পলল স্তরত্র(ম দেখা যায়। এই পলল বিভিন্ন নদী দ্বারা আনীত যার মধ্যে বালু ও কর্দমের প্রাধান্য দেখা যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার পলল সঞ্চয়ের প্রতিবেশ ঃ

মুর্শিদাবাদ জেলাতে টার্শিয়ারী (আজ থেকে ৭ কোটি বছরের পুরনো) যুগে পললের অব(প দেখা যায়। তাই টার্শিয়ারী পলল সঞ্চয়ের সম্পর্কে বিশেষ জানা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বি. বি(াস এবং এস. সেনগুপ্ত বিশেষ আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার বিষয়গুলি মুর্শিদাবাদ জেলার ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসের (ে ত্রে গু(ত্বপূর্ণ। এগুলি হ'ল —

১। জলঙ্গীর কাছে ছিল উচ্চ মেসোজোয়িক যুগের (১৯কোটি থেকে ১১কোটি বছর আগে) বিস্তৃত লাভা অঞ্চল। যার উপর রয়েছে উচ্চ ত্রি(টোসিয়াস উপযুগের (১১ কোটি বছর পূর্বের) চুনাপাথর ও কোল। এই চুনাপাথর ও কোলের সঞ্চয় ঘটেছিল জলাভূমি বা লেগুন বা আংশিক উপকূলীয় পরিবেশে। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উপকূল ছিল মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীর কাছে। অর্থাৎ সেসময় বর্তমান মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু অঞ্চল সমুদ্রের জলের তলায় ছিল।

২। তাছাড়া জলঙ্গীর কাছে স্বাদু জলের পু(পলল অব(পের (a thick section of freshwater sediment) সঞ্চয় ল(্য করা যায় ইয়োসিন উপযুগের (আজ থেকে ৭ কোটি বছর আগে) সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মধ্যবর্তী দুটি পর্যায়ে।

৩। আবার ওলিগোসিন উপযুগের (৪ কোটি বছর আগের) ভূ-তাত্ত্বিক একটি ঘটনার সাথে মুর্শিদাবাদ জেলার আভ্যন্তরীণ ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের সামঞ্জস্য ল(্য করা যায়। সেসময় উদীয়মান হিমালয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় পে¬টের উত্তর-পূর্ব ভাগে এক গ্রস্থ উপত্যকার সৃষ্টি হয় এবং রাজমহল-গাড়ো ফাঁকের উদ্ভব ঘটে। একারণে এই ফাঁকের দ(ণে এক ভারতীয় ভূখন্ডে সামুদ্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই অংশেই পরবর্তীকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপনদী ও শাখানদীর পলি অবনমিত অঞ্চলে জমা হয়ে ভরাট হয় এবং বঙ্গ অববাহিকার উৎপত্তি ঘটে এবং স্বাভাবিকভাবেই আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার সৃষ্টি হয়। এরপর মায়োসিন যুগের (৩ কোটি বছর পূর্বে) শেষ থেকে প¬ায়োসিন যুগ (দেড়কোটি বছর পুরনো) পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অংশ পুনরায় সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই সময়ে দেবগ্রাম ও তার দ(ণে পলি জমা শু(হয়েছিল ব-দ্বীপীয় ও অগভীর সামুদ্রিক পরিবেশে। এই তথ্য থেকে বলা যায় এই সময় সমুদ্র আরও দ(ণে পিছিয়ে গিয়েছিল এবং বর্তমান মুর্শিদাবাদ ভূখন্ডটি জেগে উঠেছিল।

সাম্প্রতিক উপযুগে গঠিত মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তৃত স্থান জুড়ে যে পলল স্তরত্র(ম দেখা যায় তাকে ভূ-তত্ত্বগত দিক থেকে দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় -

১। প্রাচীন যুগের পলল স্তরত্র(ম।

২। নবীন যুগের পলল স্তরত্র(ম।

ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চলের সীমান্তে ল্যাটেরাইটিক অব(পের অবস্থান ল(্যনীয়। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বীরভূম জেলার দিকে এগোতে থাকলে বিভিন্ন প্রকার অব(পের সঞ্চয় দেখা যায়, যা ঐ অঞ্চলে টিউবওয়েল বসানোর সময় পর্যবে(ণ করা হয়েছে। যেমন ক্যালকেরিয়াস নড়ুলার ঘুটিং, যার স্থানীয় নাম কঙ্কর, গ্রাভেলস, কর্দম প্রভৃতি। বালুকা (দানার মাপ ১/৬৪ মিমি. থেকে ১/২৫৬ মিমি.) ও বালুকা-কর্দমের সঞ্চয় দেখা যায়।

ভাগীরথীর পূর্বের অঞ্চল, যা বাগড়ী নামে পরিচিত, সেখানেও কর্দম জাতীয় অব(পের সঞ্চয় ল(্য করা যায়, বিশেষতঃ কালান্তর

মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী অঞ্চলের শিলাল(ণের স্তরত্র(ম				
উপযুগের নাম	বয়স (বছর)	সাধারণ শিলাল(ণ	অবস্থান ও গভীরতা (প্রায়)	অব(পনের পরিবেশ
সাম্প্রতিক		পলল, বালুকা ও গ্রাভেল	জলঙ্গীর কাছে ৭১০ ফুট	নদীয়
প-াইস্টোসিন	৫০ ল(	স্থুল বেলেপাথর যাকে বেষ্টন করে আছে মিল্ট স্টোন	জলঙ্গীর কাছে ৪২৫০ ফুট	ব-দ্বীপীয়
প-ায়োসিন	১.৫ কোটি	স্থুল বেলেপাথর	জলঙ্গীর নীচে	নদীয়
ইয়োসিন	৭ কোটি	পাতলা শেল	জলঙ্গীর কাছে ৭০ ফুট	অগভীর সামুদ্রিক
		চুনাপাথর ও বেলেপাথর	জলঙ্গীর কাছে ১০৪০ ফুট	অগভীর সামুদ্রিক
		কার্বনেসিয়াম সেলের থেকে বেলেপাথর	জলঙ্গীর কাছে ৩৮০ ফুট	স্বাদুজলীয় থেকে সামুদ্রিক
ত্রি(টোসিয়াস	১১ কোটি	ক্যালকেরিয়াস শেল ও শেলীয় চুনাপাথর	জলঙ্গীর কাছে ৩৮০ ফুট	ব্রেকি থেকে উপকূলীয়
		কর্দমকে বেষ্টিত করে রয়েছে ক্লে-স্টোন ও বেলেপাথর	জলঙ্গীর কাছে ৫২৫ ফুট	স্বাদুজলীয় থেকে খাড়ীয়
উচ্চ জুরাসিক থেকে নিম্ন ত্রি(টোসিয়াস	১৪ কোটি	ব্যাসল্ট প্রবাহ	জলঙ্গীর কাছে ৯৫০ ফুট	মহাদেশীয়

অঞ্চলে (ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যবর্তী স্থানে)। এই অব(পের স্থানে স্থানে সুক্ষ্ম সিল্টের কণাও ল(্য করা যায়।

ভাগীরথীর ডানপাড়ে বহরমপুরের ৯ কিলোমিটার দ(ণে প্রাচীন পলির উল্লেখযোগ্য 'Microgeomorphic features' দেখা যায় যা 'a huge red-bluff ' নামে পরিচিত। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপ রেনেল পর্যবে(ণ করেন এবং তাঁর ' Map of Cossimbazar Island of 1780 ' -এ নথীভুক্ত(করেন। এ অঞ্চলের মৃত্তিকা লালচে রং-এর হওয়ায় অঞ্চলটি স্থানীয় মানুষের কাছে 'রাঙামাটি' নামে পরিচিত।

মৃত্তিকা

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য জলবিভাজিকা ও জলবায়ুর উপর নির্ভর করে জেলায় যে মৃত্তিকা অঞ্চলগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলি হল—

মৃত্তিকা পরিবার ঃ ক) বিন্ধ্য গোত্রীয় পলি
খ) গাঙ্গেয় পলি

মৃত্তিকা গোষ্ঠী ঃ ১) গঙ্গা নদীসংলগ্ন ভূমি
২) গাঙ্গেয় সমতল ভূমি
৩) গাঙ্গেয় উচ্চভূমি
৪) গাঙ্গেয় নিম্নভূমি
৫) রাজমহল নদীসংলগ্ন ভূমি
৬) রাজমহল সমতল ভূমি
৭) রাজমহল উচ্চভূমি

এই মৃত্তিকা পরিবার গুলির সং(প্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হ'ল। মৃত্তিকা গোষ্ঠীগুলির মহকুমা ভিত্তিক মানচিত্রও সংযোজিত হ'ল।

বিন্ধ্যগোত্রীয় পলি, এই মৃত্তিকা পরিবারটির নামকরণ হয়েছে

তাদের উৎপত্তিস্থল ও ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে। বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তর-পূর্বদিকের সম্প্রসারিত অংশ, অর্থাৎ রাজমহল থেকে নির্গত নদীগুলির বয়ে আনা পলি থেকে এই মৃত্তিকা পরিবারের সৃষ্টি। যে পার্বত্য অঞ্চলে এই নদীগুলির উৎপত্তি, ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে তা উচ্চ গন্ডোয়ানা (মহাদেব) যুগের। এর পর নদীগুলি প্রায় সাম্প্রতিক যুগের ল্যাটেরাইট অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বীরভূমের পলিগঠিত সমভূমি পার হয়ে মুর্শিদাবাদে এসে ভাগীরথীর সাথে মেশে।

অন্যদিকে গঙ্গা এবং তার উপনদী ও শাখানদীগুলির বয়ে আনা পলির দ্বারা গঠিত সমস্ত মৃত্তিকাই গাঙ্গেয় পলিমৃত্তিকা পরিবার ভুক্ত।

এই দুটি মূল মৃত্তিকা পরিবার ছাড়া জেলার উত্তরের একাংশে এমন মৃত্তিকা দেখা যায় যা অংশত গাঙ্গেয় পলি ও অংশত বিন্ধ্যগোত্রীয় পলি দিয়ে তৈরী। গুমানি, বাগডোবা, প্রভৃতি নদী এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে মেশে। ফরাক্কা থানা এলাকার মৃত্তিকার কিছুটা অংশ গন্ডোয়ানা অঞ্চলের পলি দিয়ে গঠিত। এই অঞ্চল মাত্র ৩১,২৩২ একর। এত ক্ষুদ্র অঞ্চলকে পৃথক মৃত্তিকা পরিবার রূপে চিহ্নিত করা অর্থহীন। সুতরাং এটিকে গাঙ্গেয় পলির রূপভেদ হিসাবেই দেখানো হয়েছে।

এই মৃত্তিকা পরিবারগুলির থানাভিত্তিক বিভাজন নিচে দেওয়া হ'ল—

১) গাঙ্গেয় পলি মৃত্তিকা পরিবার ঃ ডোমকল, রাণীনগর, অবিভক্ত বেলডাঙ্গা,বহরমপুর,ভগবানগোলা থানা, ও লালবাগ, লালগোলা থানা, ফরাক্কা, রঘুনাথগঞ্জ, সুতি, সামশেরগঞ্জ থানা এবং সাগরদীঘি ও ফরাক্কা থানার পূর্বভাগ।

২) বিন্ধ্যগোত্রীয় পলি পরিবার ঃ অবিভক্ত ভরতপুর থানা, বড়এঞা, কান্দী, খড়গ্রাম, নবগ্রাম এবং বাবলা নদীর পূর্বভাগ ব্যতীত সাগরদীঘি থানা।

৩) গাঙ্গেয় পলির রূপভেদ ঃ ফরাক্কা থানার একাংশ।

এই মৃত্তিকা পরিবারগুলিকে আবার মৃত্তিকা গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। ভূমিরূপ, গঠন পদ্ধতি, বিবর্তনের ধরন ইত্যাদি বিচার ক'রে গাঙ্গেয় পলি পরিবারকে চারটি গোষ্ঠীতেএবং বিন্ধ্যগোত্রীয় পলি পরিবারকে তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।

গাঙ্গেয় পলি পরিবার ঃ

(ক) গঙ্গা নদী সংলগ্ন মৃত্তিকা গোষ্ঠী ঃ এই মাটি দেখা যায় বেলডাঙ্গা, ভগবানগোলা, লালগোলা, সুতি, ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদ থানা, রাণীনগর থানার উত্তরাংশ, রঘুনাথগঞ্জ থানার পূর্বভাগ ও বহরমপুর থানার মধ্যাংশে। সাম্প্রতিক পলি, বন্যাজনিত পলি ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্টি এই মাটি সুগঠিত নয়। কর্দম বা চুনের সঞ্চয় দেখা যায় না। বিভিন্ন স্তরে পলির সঞ্চয়ও আলাদা করে বোঝা যায়।

(খ) গঙ্গা সমতল ভূমির মৃত্তিকা ঃ এটি নবীন পলি, বন্যার সময় সঞ্চিত পলি ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট। এই মৃত্তিকা সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ নয়। তবে পূর্বোক্ত মৃত্তিকার তুলনায় কিছুটা জমাটবাঁধা। নিচের স্তরে সামান্য কর্দমের সঞ্চয়ও দেখা যায়। জলঙ্গী ও ডোমকল থানা, মুর্শিদাবাদ থানার পূর্বভাগ, বহরমপুর থানা, রাণীনগর থানার দক্ষিণভাগ, ভগবানগোলা থানা এবং হরিহরপাড়া থানার উত্তর ভাগে এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

(গ) গাঙ্গেয় উচ্চভূমির মৃত্তিকা ঃ প্রাচীন পলি, পলিগঠিত সমভূমির মৃত্তিকার উপাদানগুলি সুসংবদ্ধ না হলেও পূর্বের দুই প্রকার মৃত্তিকার তুলনায় সুগঠিত। এই মৃত্তিকায় কর্দমের মাঝারি মাত্রার সঞ্চয় দেখা যায়। যথেষ্ট পরিমানে জমাটবাঁধা চুনও থাকে। রঘুনাথগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর থানা, মুর্শিদাবাদ থানার পশ্চিমভাগে এই মাটি দেখা যায়। সুতিতে পাগলা নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিমে, সামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কা থানার পশ্চিমাংশেও এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

(ঘ) গাঙ্গেয় নিম্নভূমি ঃ নিম্ন সমভূমি ও নিম্নভূমির বা অবনতভূমির মৃত্তিকার উপাদানগুলিও তেমন সুসংবদ্ধ নয়। কিন্তু তার সবথেকে নিচের স্তরে প্রচুর কর্দমের সঞ্চয় দেখা যায়। চাটুর মত আকৃতির এই কর্দম মাটির উপরিভাগে থাকায় জল চুঁইয়ে নিচে নামতে পারে না। এই মৃত্তিকার প্রান্তসীমায় থাকে চুন বা চুনমিশ্রিত লোহা যা জলে নরম হয় না বা ভেঙে যায় না। এই মৃত্তিকা দেখা যায় নওদা থানা, হরিহরপাড়া থানার দক্ষিণভাগে, বেলডাঙ্গার পূর্বভাগে এবং গাঙ্গেয় পরিবারভূক্ত মৃত্তিকা আছে এমন অঞ্চলের যে কোন নিম্নভূমিতে।

বিন্ধ্যগোত্রীয় পলি ঃ

রাজমহল নদী-সংলগ্ন মৃত্তিকা ঃ অবিভক্ত বিহারের গন্ডোয়ানা অঞ্চলের এবং বিভিন্ন যুগের আগ্নেয় শিলা বাতাসের অ্যাসিডের ক্রিয়ায় বা আবহবিকাবেরর ফলে ক্ষয়ে যায় এবং বিভিন্ন নদী দ্বারা বাহিত হয়ে তার অবক্ষেপ সঞ্চিত হয় পলিগঠিত সমভূমিতে। এভাবেই এই মৃত্তিকার সৃষ্টি। বড়এঞা থানা, ভরতপুর থানার উত্তর-পশ্চিম ভাগ, কান্দীর দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ, নবগ্রাম ও খড়গ্রাম থানার দক্ষিণভাগে এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

রাজমহল সমতলভূমি ঃ প্রাচীন সমভূমির এই মৃত্তিকা সুগঠিত নয়। এই মৃত্তিকার নিচের স্তরে কিছুটা কর্দম এবং অনেকটা চুনের

সঞ্চয় দেখা যায়। মৃত্তিকা স্তরের মধ্যে মধ্যে ২-৩ ফুট নিচে দেখা যায় গোলাকারে জমাট বাঁধা লোহা বা লোহা মিশ্রিত ম্যাঙ্গানীজ। এটি দীর্ঘসময় জল জমে থাকার চিহ্(। ভরতপুর, খড়গ্রাম, কান্দী এবং নবগ্রাম থানায় এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

রাজমহল উচ্চভূমি ঃ প্রাচীন সমভূমির মৃত্তিকার ধর্ম এই অঞ্চলে দেখা যায়। এই মৃত্তিকার উপরে থাকে ডলোমাইট ও নিচের স্তরে থাকে কর্দম। প্রচুর পরিমাণে চুন ও লোহা জমাট বাঁধা অবস্থায় আঠালো কর্দমের সাথে মিশে থাকে। ফলে জল নিচের দিকে নামতে পারে না। সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানায় এ ধরনের মৃত্তিকা দেখা যায়।

এই মৃত্তিকা অঞ্চলগুলির বৈশিষ্ট্য নিচের সারণীতে দেওয়া হ'ল ঃ-

উৎপত্তি ও গঠন	গঙ্গা নদীসংলগ্ন ভূমি	গাঙ্গেয় সমতল ভূমি	গাঙ্গেয় উচ্চভূমি	গাঙ্গেয় নিম্নভূমি	রাজমহল নদীসংলগ্ন ভূমি	রাজমহল সমতল ভূমি	রাজমহল উচ্চভূমি
বর্ণ	জলপাই/ বাদামী	জলপাই/ গাঢ় ধূসর	জলপাই বাদামী/ গাঢ় বাদামী	জলপাই/ গাঢ় ধূসর	হলুদাভ বাদামী	গাঢ় হলুদাভ বাদামী	গাঢ় হলুদাভ বাদামী
দৃঢ়তা	দৃঢ় নয়	দৃঢ় নয়/ম্যাঙ্গানীজ, লোহা মিশ্রিত নুড়ি	ডলোমাইট যুক্ত(সাদা ঘুটিং	লোহা,ম্যাঙ্গানীজ মিশ্রিত দানা	দৃঢ় নয়	জমাট গোলাকার পাতলা লৌহস্তর	চুন ও লোহা মিশ্রিত কর্দম
স্তরবিন্যাস	পর্যায়ক্র(মিক পলিস্তর	অস্পষ্ট	স্পষ্ট	স্পষ্ট	স্পষ্ট স্তরভেদ	ইলিউভিয়েটেড অঞ্চলের অস্তিত্ব	স্পষ্ট ইলিউভিয়ে- -টেড অঞ্চল
অম্ল (ার ভারসাম্য	৭.৫ - ৮.০	৮.০ - এর বেশী	৬ - ৭.৫	৮.০ - এর বেশী	-	-	-
চুনের পরিমাণ	১ - ১০ শতাংশ	১ - ৫ শতাংশ	০.৫-৪ শতাংশ	১ - ১০ শতাংশ	০.০ শতাংশ	০.০ শতাংশ	০.০ শতাংশ
কার্বনের অক্সাইডের প্রকৃতি	গতিশীল	অল্প গতিশীল, নিম্নমুখী	নিম্নস্তরে দ্রুত গতিশীল	-	গতিশীলতা নেই	চুঁইয়ে নামার প্রবণতা	গতিশীল অঞ্চল
পলির ভাগ	মাঝারি অথবা কম	মাঝারি অথবা কম	মাঝারি অথবা বেশী	প্রায় অর্ধেক	খুবই কম	গড়ের কিছু বেশী	খুব বেশী
দ্রবীভূত লবন	কম	কম	কম	বেশী	কম	কম	কম
চুন সম্পৃক্তি(	৯০ শতাংশের বেশী	প্রায় ৮০ শতাংশ	প্রায় ৭০ শতাংশ	প্রায় ৬০ শতাংশ	-	-	-
জল নিকাশ	মাঝারী	ভাল	খারাপ	বাধাপ্রাপ্ত ও খুব খারাপ	খারাপ থেকে মাঝারী	খারাপ থেকে মাঝারী	ভাল

সূত্রঃ-এ রিপোর্ট অন দি সয়েল ওয়ার্কইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, প্রথম খন্ড, ডিস্ট্রিক্ট মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৫৮

জলনির্গমন পথ

ভাগীরথীর পশ্চিমে এ জেলার যে অংশ তার ভূমিঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দ(ণ-পূর্বদিকে এবং জলনির্গমনও হয় এই অভিমুখে। কিন্তু ভাগীরথীর পূর্বভাগে বিভিন্ন নদী একমুখে প্রবাহিত হয় না। জল নির্গমন পথ এ অংশে তাই অনিয়মিত।

জেলার পশ্চিমভাগের ঢাল পূর্বদিকে, অর্থাৎ ভাগীরথীর অভিমুখে। কিন্তু পশ্চিমের মালভূমি থেকে নেমে আসা জলধারাগুলি সরাসরি নদীতে পড়েনা। গতিপথে জলবহন করে তারা এসে পড়ে বিল ও জলাভূমিতে। এই বিল ও জলাভূমিগুলি জলাধার হিসাবে কাজ করে বন্যার ব্যাপকতা কমাতে স(ম। পরে এই জলাভূমি ও বিল থেকে আবার নদী নির্গত হয়ে দ(ণ ও দ(ণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

জেলার পূর্বাংশ সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের মতো। গঙ্গা এবং ভাগীরথী তার সমান দুটি বাহু এবং জলঙ্গী তার ভূমি। এই তিন

বাহুর কোনো একটি বরাবর জেলার পূর্বভাগের জলনির্গমন পথ নয়। স্থানীয় বৃষ্টিপাতের জলভার গঙ্গা কিংবা ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ে না। বরং ভাগীরথীর উদ্বৃত্ত জল পদ্মার দিকে ধাবিত হয় এবং পদ্মার উদ্বৃত্ত জলও ধাবিত হয় ভাগীরথীর দিকে(শেষে এই মিলিত জলধারা মধ্যবর্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করে দ(িণ-পূর্বদিকে নিঃ(ান্ত হয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, এই বিপুল উদ্বৃত্ত জল গোবরানালা, ভৈরব ও শিয়ালমারী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলঙ্গীতে গিয়ে পড়ে। বর্ষাকালে এই নদীগুলি বিভিন্ন বিল ও খালের মাধ্যমে যুক্ত(হয়ে যায় এবং এক বিস্তীর্ণ জলপথের জালিকা তৈরী করে।

নদনদী ঃ

গঙ্গা-পদ্মা এবং তার শাখানদী ও উপনদী সমুহ যেমন ময়ূরা(ী (স্থানীয় ভাষায় মোর বলে), গুমানি, বাঁশলোই, পাগলা প্রভৃতি দ্বারা মুর্শিদাবাদের বিস্তৃত সমভূমি বিধৌত।

এই জেলায় যে সমস্ত নদী আছে তাকে মূলতঃ দুটি ব্যবস্থায় ভাগ করা যায়।

১। পদ্মা বা গঙ্গা নদী ব্যবস্থা ঃ এই নদী ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও অজস্র (ুদ্র (ুদ্র জলধারা যেমন- শিয়ালমারী, ভৈরব প্রভৃতি। এর মধ্যে গু(ত্বপূর্ণ হল ভাগীরথী, জলঙ্গী ও ভৈরব। জলঙ্গী ও ভৈরব একসময় বেশ বড় নদী ছিল কিন্তু এখন তারা বর্ষাকালে গঙ্গা ও ভাগীরথীর বাড়তি জল বহন করার সময়েই কেবল নদীর চেহারা লাভ করে। অন্য সময় তারা জলধারাহীন ও মন্থরগতি। এই নদীগুলিতে সঞ্চিত পলি বহন করার মতো স্রোত থাকে না। ফলে চড়া পড়ে এবং নাব্যতা থাকে না।

২। ময়ূরা(ী বা পশ্চিমের নদী ব্যবস্থা ঃ ময়ূরা(ী, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী এবং অন্যান্য নদী সমূহ এই নদী ব্যবস্থার অন্তর্গত।

এই নদী ব্যবস্থাকে আবার দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়-

১। উত্তর-পশ্চিমে রাজমহল পাহাড়িয়া অঞ্চল থেকে নির্গত বাঁশলোই-পাগলা-গুমানি নদী বিভাগ।

২। দ(িণে ব্রাহ্মণী-দ্বারকা-ময়ূরা(ী নদী বিভাগ।

উইলকক্স -এর মতে এই সমস্ত নদীগুলো গঙ্গার থেকে অনেক পুরানো। এই নদীসমূহ শতশত বছর ধরে বালুকা ও শিল্ড সঞ্চয় করে ভাগীরথীর পশ্চিমপাড়ে ব-দ্বীপ সমভূমি গঠনে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

গঙ্গা বা পদ্মা ঃ গঙ্গা এ অঞ্চলে পদ্মা নামে পরিচিত। গঙ্গা বা পদ্মা মুর্শিদাবাদের উত্তরতম প্রান্ত ছুঁয়ে এ জেলায় প্রবেশ করে এবং জেলার পূর্বসীমা বরাবর দ(িণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়।গঙ্গা মালদহ ও রাজশাহী জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাকে পৃথক করে রেখেছে।

প্রতিবছর ত্র(মাগত পলি সঞ্চয় ও ভূমি(য়ের মাধ্যমে গঙ্গা এক কূল ভেঙে অন্য কূল গড়ে তোলে। বর্ষায় গঙ্গার স্রোত নরম মাটির তীরদেশে প্রবল চাপ তৈরী করে ও ভূমি(য় ঘটায়। এক একর জমি নদী গর্ভে বিলীন হতে এক ঘন্টা সময়ও লাগে না। একই সঙ্গে নদীখাতের গর্ভে তৈরী হয় বৃহদাকার দ্বীপসদৃশ চরভূমি— কোন কোনটা কয়েক মাইল দীর্ঘ। শেরউইল লিখেছেন, এরকম চরভূমিতে একবছরের মধ্যে তিনি ঘাস ও গাছ জন্মাতে দেখেছেন, দেখেছেন মানুষ এই চর পরিষ্কার করে বাসোপযোগী করেছে, বসতি গড়েছে, চাষ-আবাদ শু(করেছে, গ্রাম গড়ে তুলেছে।

ভাগীরথী ঃ ফরাক্কার ২৫ মাইল দ(িণে নুরপুরের কাছে গঙ্গা থেকে ভাগীরথী নির্গত হয় এবং প্রায় দুই মাইল পদ্মার সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। সুতি থানার বি(নাথপুর পর্যন্ত এভাবে প্রবাহিত হওয়ার পর ভাগীরথী দ(িণাভিমুখে বয়ে চলে এবং পলাশীর কাছে বিধুপাড়া গ্রামে জেলার সীমানা অতিত্র(ম করে। ভাগীরথী জেলার মধ্যদেশ বরাবর প্রবাহিত হয়ে জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি প্রায় সমানভাগে ভাগ করেছে - পূর্বভাগ বাগড়ী এবং পশ্চিমভাগ রাঢ়। জঙ্গীপুরের কিছুটা উত্তরে বাঁশলোই ও পাগলার মিলিত ধারা ভাগীরথীতে এসে মেশে। দ(িণে শক্তি(পুরের কাছে দ্বারকার একটি শাখা পশ্চিম থেকে এসে মিলিত হয়।

ভাগীরথীর একদিকের পাড় ভূমির সমতল থাকে, অন্যদিকের পাড় হয় উচ্চভূমি। স্রোতের পরিবর্তনের জন্য এমনটা হয়। একই দিকের তীর কখনো উঁচু হয়, কখনো তীর তার প্রকৃতি পাল্টায়। একটা সময় বর্ষার চারমাস জল থাকত ভাগীরথীতে, বাকী সময় থাকত শীর্ণকায়া। ভাগীরথী যেহেতু পদ্মার শাখা, পদ্মার অতিরিক্ত(জলে তার পুষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু পদ্মার খাতটি ভাগীরথীর থেকে প্রায় ১ মিটার নীচে হওয়ায় ভাগীরথী বছরে ৮/৯ মাস পদ্মার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতো। কেবল বর্ষার সময় পদ্মার জল ভাগীরথীতে প্রবেশ করত।

গঙ্গার জল থেকে বঞ্চিত হলেও ভাগীরথী নদী বেঁচেছিল পশ্চিমের জলাভূমি ও মালভূমি থেকে নেমে আসা উপনদীর জলে। যাই হোক মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর উৎসমুখ কেটে পদ্মা বা গঙ্গা থেকে জল আনার চেষ্টা উনবিংশ শতক থেকে বহুবার ব্যর্থ হয়। পরে নদী বিজ্ঞানী ডঃ হেনসেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ হয় ১৯৬৩-৭১ সালে। পরে প্রায় চার বছর ধরে ৩৮ কিমি দীর্ঘ একটি খাল কেটে গঙ্গা ও ভাগীরথীকে যুক্ত(করা হয়। জঙ্গীপুরে আরেকটি ছোট ব্যারেজ তৈরী করে ভাগীরথীর উৎসমুখটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে ফিডার ক্যানেলের জল বিপরীতমুখী গতিতে আবার গঙ্গা বা পদ্মায় ফিরে যেতে না পারে।

ফরাক্কা ব্যারেজ হওয়ার পর ভাগীরথীর শুকনো বুক পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন ভাগীরথী নদীর রূপ বদলেছে। ফরাক্কা বাঁধের জলে নদীর বুক উচ্ছল।

ভাগীরথী প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, জেলার এ অংশের জল নির্গমন পথ ভাগীরথী নদী বরাবর উত্তর থেকে দ(িণে নয়— তা উত্তর-পশ্চিম থেকে দ(িণ-পূর্বাভিমুখী। ফলে বন্যার সময় ভাগীরথীর উদ্বৃত্ত জল ভাগীরথীর পূর্বতীর ভেঙে বা টপকে প্রবাহিত হয় এবং ভাগীরথীর প্রাচীন ও পরিত্যক্ত(নদীখাতগুলি দিয়ে জলঙ্গী নদীর দিকে বয়ে চলে। এ কারণেই ভাগীরথীর পূর্বতীরে বিস্তৃত বাঁধ দিতে হয়েছে।

জলঙ্গী ঃ জলঙ্গী এ জেলার আরেকটি গু(ত্বপূর্ণ নদী। জলঙ্গী গ্রামের সামান্য উত্তরে এই নদী পদ্মা থেকে নির্গত হয়। তার পর দ(িণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বালি গ্রামের কাছে হঠাৎ বাঁক নিয়ে জলঙ্গী এ জেলার সীমানা অতিত্র(ম করে যায়।

পদ্মা থেকে জলঙ্গীর নির্গত হওয়ার স্থানটি এখন পলি জমে বন্ধ হয়ে গেছে। জলঙ্গীর উৎপত্তিস্থলের কাছ থেকে পদ্মার অপর একটি উপনদী নির্গত হয়েছে- হাঙর ডোবা। হাঙর ডোবা ভারত-বাংলাদেশ সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয় এবং জলঙ্গী প্রবাহিত হয় হাঙর ডোবার পশ্চিম দিক দিয়ে। মাথাভাঙার মূল শাখা বা মূল স্রোতের উৎপত্তি হাঙর ডোবার উৎপত্তিস্থলের চেয়ে চার মাইল দূরে। পরে হাঙর ডোবা বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মাথাভাঙার মূল স্রোতে মিলিত হয়।

জলঙ্গী ধীরে ধীরে পূর্বদিকে সরে যায় এবং কিছুটা পথ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়। এরপর জলঙ্গী নদী নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়। এখানে পদ্মার অপর একটি শাখা শিয়ালমারী, ভৈরব ও জলঙ্গীর মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে জলঙ্গীতে মিলিত হয়। কিছু পরে ভৈরবও মিলিত হয় জলঙ্গীর সঙ্গে। জলঙ্গী, শিয়ালমারী ও ভৈরবের মিলিত ধারা আঁকাবাঁকা পথে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত বরাবর প্রায় ২০ মাইল প্রবাহিত হয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করে ও নবদ্বীপের কাছে হুগলী নদীতে মেশে। নিম্ন অববাহিকায় জলঙ্গী খরিয়া নামে পরিচিত।

পদ্মা থেকে জলঙ্গীর উৎপত্তিস্থল পলি জমে অবরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে পদ্মা থেকে প্রচুর উদ্বৃত্ত জল জলঙ্গীতে আসতো। এখন ভৈরব-জলঙ্গী সঙ্গমস্থলের উত্তরভাগ বর্ষার সময় ছাড়া শুকনো থাকে। শিয়ালমারীর স্রোতও পলি জমে অব(দ্ধ। কেবল বর্ষার সময় পদ্মার জল শিয়ালমারীতে প্রবেশ করে। নদীগুলি এখন হৃতশক্তি(। তবে বর্ষায় তারা বন্যার কারণ।

ভৈরব ঃ ভৈরব একটি প্রাচীন নদ। এর সম্পূর্ণ খাতের একাংশ বহুকাল আগেই পরিত্যক্ত(। প্রাচীন ভৈরব নদের কিছু অংশমাত্র এখন দৃশ্যমান। মহানন্দা যেখানে এসে পদ্মা বা গঙ্গায় মিশেছে তার অপর দিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে পদ্মা থেকে ভৈরবের উৎপত্তি। আদি উৎপত্তিস্থলটি লালগোলা থানার অন্তর্ভুক্ত(। অনেকের মতে পদ্মা যখন গঙ্গার মূলধারা ছিল না তখন মহানন্দাই অখন্ড ধারায় ভৈরবের খাত বরাবর প্রবাহিত হতো। ত্র(মে পদ্মার স্রোতধারা প্রধান হয়ে ওঠে। মহানন্দার জলধারা পদ্মাতে মিলিত হয়ে পদ্মার খাত বরাবর নিষ্কাশিত হয়, ভৈরবের খাতে জলাভাব দেখা দেয় এবং তার গু(ত্ব হ্রাস পায়। যাই হোক, এখন পদ্মার এই শাখানদীটি বর্ষার কয়েকমাস পদ্মার জল পায়, অন্য সময় তা শুষ্ক থাকে। জেলার মধ্যে দিয়ে কিছুটা পথ প্রবাহিত হয়ে ভৈরব জলঙ্গীতে মিলিত হয়।

ময়ূরা(ী নদী ব্যবস্থা বা পশ্চিমের নদী ব্যবস্থার নদ-নদীগুলির উৎপত্তি ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত সাঁওতাল পরগণায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাগলা-বাঁশলোই, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বাবলা এবং ময়ূরা(ী।

পাগলা ও বাঁশলোই ঃ জেলার উত্তরে পাগলা-বাঁশলোই অববাহিকা। পাগলা ও বাঁশলোই ভাগীরথীর গু(ত্বপূর্ণ উপনদী। হুসেনপুরের কাছে বাঁশলোই বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করে এবং জঙ্গীপুর শহরের উত্তরে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তা পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়। বাঁশলোই -এর সামান্য দ(িণে পাগলা জঙ্গীপুর মহকুমায় প্রবেশ করে এবং সোজা পূর্বাদিকে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে মেশে।

ব্রাহ্মণী ঃ খরস্রোতা এই নদীটির উৎপত্তি পার্(বর্তী ঝাড়খন্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণায়। এই অববাহিকার একটি অংশ রয়েছে এই রাজ্যের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নারায়ণপুরে এই নদী বীরভূম জেলায় প্রবেশ করে ও সাঁওতাল পরগণা থেকে নির্গত ত্রিপিতা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এরপর রামপুরহাট ও নলহাটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাঁকোঘাটের কাছে ব্রাহ্মণী দ্বারকার সাথে মিলিত হয়।

দ্বারকা / বাবলা ঃ দ্বারকা / বাবলা একটি মাঝারি মাপের নদী। মুর্শিদাবাদের দ(িণ-পশ্চিম এলাকায় এই নদীটি অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী সহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। দ্বারকা নামে পরিচিত এর মূল ধারাটি মোরগ্রামের কাছাকাছি বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করে। রামচন্দ্রপুরে ব্রাহ্মণীর জলধারা এসে মেশা পর্যন্ত দ্বারকা / বাবলা পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়। এর পর ব্রাহ্মণী ও দ্বারকার মিলিত জলধারা দ(িণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হওয়ার পর বীরভূম থেকে আসা ময়ূরা(ী ও কুয়ে পশ্চিম দিক থেকে

এসে তার সঙ্গে মেশে। এরপর অসংখ্য পার্শ্বশাখা দ্বারা নদীটি ভাগীরথীর সঙ্গে সংযুক্ত(হয়। এর মধ্যে দুটি সংযোগ-শাখা অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ—বাঁকা এবং ছোড়া-ডেকরা। মূলধারাটি কান্দী মহকুমার পূর্বসীমা বরাবর প্রবাহিত হয় এবং রঘুপুরের কাছে জেলার সীমানা অতিত্র(মে করে যায়। কান্দী মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, ময়ূরা(ী, কানা ময়ূরা(ী, কুয়ে ও বাবলার অববাহিকায় অবস্থিত। পাহাড়ী নদীগুলি ও তাদের উপনদীগুলি মিলিত হয়ে তৈরী হয় বাবলা নামের প্রধান জলধারা। উচ্চ ও নিম্ন অববাহিকায় বৃষ্টির পরিমান বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে শু(করলে এই মিলনস্থলে একটি বিরাট হ্রদ তৈরী হয় যা ঐ অঞ্চলে হিজল বিল নামে পরিচিত। হিজলের উদ্বৃত্ত জল দ্বারকা-বাবলার মূল ধারা রূপে প্রবাহিত হয়ে কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীতে মিলিত হয়।

বিল ও জলাভূমি

নদী মাতৃক এই জেলায় রয়েছে অনেকগুলি বিল ও জলাভূমি। স্থানীয় নাম বিল বা ঝিল। এই বিল ও ঝিলগুলির বেশীর ভাগই তৈরী হয়েছে পুরাতন নদীখাত থেকে। জেলার নিম্ন জলাভূমিগুলির মধ্যে হিজল বিল ও কালান্তর বিল সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। জেলার প্রধান নদী ভাগীরথী, যা জেলাকে উত্তর থেকে দ(িণ পর্যন্ত মাঝামাঝি দুই ভাগে ভাগ করেছে। ওই দুই ভাগের মধ্যে ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে কান্দী মহকুমায় ময়ূরা(ী ও দ্বারকা নদীর পূর্বে হিজল বিল এবং ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে জেলার পূর্ব- দ(িণে গোবরানালার অববাহিকায় জলঙ্গী নদীর আগে কালান্তর বিল অবস্থিত। জেলার আর একটি বিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেটি হল মতিঝিল। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে দুই মাইল পূর্ব -দ(িণে অর্দ্ধখুরাকৃতি এই বিল তৈরী হয়েছিল ভাগীরথী তার গতিপথ পরিবর্তন করায়। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে খাগড়াঘাট রেলস্টেশনের কাছে তিন মাইল দীর্ঘ ও পৌনে তিন মাইল প্রশস্ত জলাভূমিটির নাম তেলকার বিল। বহরমপুর শহরের পূর্বদিকে রয়েছে বিষু(পুর, চালতিয়া ও চাঁদা বিল। বিষু(পুর বিলটিও অর্দ্ধখুরাকৃতি। বহরমপুরের উত্তর - পূর্ব দিক থেকে শু(হয়ে কাশিমবাজার রেলস্টেশনের প্রায় এক কিলোমিটার দ(িণ-পূর্ব দিক দিয়ে এই বিল গিয়ে শেষ হয়েছিল খাগড়ার বড়মুড়ির কাছে। বিষু(পুর বিল ভাগীরথী নদীর সঙ্গে দুটি স্লুইস গেট দ্বারা যুক্ত(, খাগড়া ও বহরমপুর স্লুইস। বহরমপুরের নিকাশি জল বিভিন্ন পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা বাহিত হয়ে বিষু(পুর বিলের ওই দুই স্লুইস গেট দিয়ে ভাগীরথীতে পতিত হ'ত। সাতের দশকের পর বিষু(পুরের ওই দুটি স্লুইস গেটের মধ্যে খাগড়া বড়মুড়ির ধারের গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং কল্পনা সিনেমার নিকট ছোট মুড়িতে অবস্থিত স্লুইস গেটটি অকেজো হয়ে পড়েছে। ওই দুই স্লুইস গেট সেচ দপ্তর নিয়ন্ত্রিত। খাগড়া বড়মুড়ির স্লুইস গেট বন্ধ করে এবং বিষু(পুর বিলের দ(িণ-পশ্চিম মুখ ও বেশ কিছু অংশ বুজিয়ে খাগড়ায় ইন্দ্রপ্রস্থ নামক নতুন উপনগরী তৈরী হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অতি বর্ষণে বিলের বিভিন্ন পয়ঃপ্রণালী দিয়ে জমে যাওয়া জল নিষ্কাশন না হওয়ায় ২০০০ সালের বর্ষায় ইন্দ্রপ্রস্থ এলাকায় জল জমে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। বিষু(পুর বিলে বর্তমানে হচ্ছে সমবায় ভিত্তিতে ব্যাপক মৎস্যচাষ।

ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে গোরাবাজারের অদূরে বহরমপুরের দ(িণ-পূর্বে জজ কোর্টের কাছে অর্দ্ধখুরাকৃতি চালতিয়া বিল অবস্থিত। এই বিলের ধারে রয়েছে ভাকুরী, চালতিয়া, কৃষ(মাটি এবং হরিদাসমাটির নিকট কল্যাবেড়িয়া। বাহাদুরপুর ও তারাকপুরের দ(িণে এবং মানকড়ার উত্তরে চার মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রশস্ত জলাভূমিটির নাম চাঁদা বিল। ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চাঁদের বিল ও চালতিয়া বিল কেটে গোবরানালার সঙ্গে সংযুক্ত(করা হয়। কিন্তু খুব গভীরভাবে না কাটায় তা জল নিকাশের উপযোগী হয়নি। এই জেলার পূর্বদিকে অন্যান্য বিলগুলির মধ্যে গোয়াস (৮ বর্গ মাইল), ডোমকল (৬ বর্গ মাইল) ও ভান্ডারদহ বিল উল্লেখযোগ্য।

ভাগীরথীর পশ্চিমে রয়েছে বেলুন, সাকোড়া এবং পাটন বিল। এই তিনটি বিলই খড়গ্রাম থানা এলাকায়, ব্রাহ্মণী ও দ্বারকা নদীর সঙ্গমস্থল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দ(িণে। এগুলি বিষু(পুর জলাভূমির সদৃশ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী খরচে এই বিলগুলিকে নদীর সঙ্গে যুক্ত(করা হয়েছিল। তিনটি বিলই নদীর সঙ্গে নীচু ক্যানেল দ্বারা যুক্ত(ছিল। বর্ষার সময় ওই তিনটি বিলই এক হয়ে বিশাল জলাভূমিতে পরিণত হয়। ময়ূরা(ী ও কুয়ে যেখানে দ্বারকা নদীর সঙ্গে মেশে নওরাঙা, শোলমারী, সালুকুরিয়া ইত্যাদি বিলগুলি আর অনেকগুলি ছোট ছোট বিল মিলে বর্ষার সময় ওই স্থান পরিণত হ'ত ৩০ কিমি জলাভূমিতে। ওই বৃহৎ জলাভূমি বন্যার সময় অনেক জল ধরে রাখত এবং নদীতে যখন জল থাকত না তখন সেচের কাজে লাগত। নদীর জল কমে গেলে বিলের জল ধীরে ধীরে নদীতে পড়ে নিষ্কাশিত হত। এই প্রাকৃতিক জলাধারগুলি, বিশেষতঃ রাঢ়ের দ(িণে, পাহাড়ী নদীর জলবাহিত পলি জমে জলধারণ (মতা অনেকটাই হারিয়েছে।

জঙ্গীপুর মহকুমা মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে অবস্থিত। ওই মহকুমার বিলগুলির মধ্যে পাঁচটি বৃহৎ বিলই উল্লেখযোগ্য। যথাত্র(মে ভাগীরথীর পশ্চিমে চাচন্দ এবং বংশবাটী বিল এবং ভাগীরথীর পূর্বে কৃষ(সাইল, পোড়ামারী এবং গাঙনী বিল অবস্থিত। কৃষ(সাইল বিল নদীর পুরোনো খাত এবং এখনো তার কোন কোন অংশ বেশ গভীর। কিন্তু বিলটির চার পাশের জমিতে চাষ ত্র(মশঃ

বাড়ছে। বর্ষার সময় বংশবাটী বিল ভাগীরথীর তীরে বালিঘাট থেকে সাঁওতাল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু গ্রীষ্মে মাত্র সামান্য কিছু গভীর অংশে জল থাকে।

বিল ও জলাভূমিগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে তৈরী হয়েছিল, প্রকৃতির খেয়ালেই তারা আবার হারিয়ে যাচ্ছে। বর্ষায় ও অন্য সময়ে নদী ও নিকাশি জলে বয়ে আসা পলি মাটি ও বর্জ্যতে পূর্ণ হয়ে বিলগুলির খাত বুজে যাচ্ছে। ক্রমোগত বাড়ছে চাষের এলাকা।

প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে যেমন তৈরী হয়েছিল অনেকগুলি ঝিল বা বিল, তেমনি মানুষও খননকার্য চালিয়ে তৈরী করেছে এই জেলায় অনেকগুলি বিলসদৃশ দীঘি। ওই দীঘিগুলির মধ্যে সাগরদীঘি রেলস্টেশনের কাছে প্রায় এক মাইল লম্বা দীঘিটির নাম সাগরদীঘি। জনশ্রুতি ওই দীঘিটি খনন করেছিলেন পাল রাজা মহীপাল । দ্বিতীয় বৃহত্তম দীঘিটির নাম সেখের দীঘি। মোরগ্রাম (বোখারা) রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৮ কিমি উত্তরে সেখের দীঘি অবস্থিত। ওই দীঘির পাড়ে আছে এক জন ফকিরের সমাধি। ওই ফকিরের সম্মানে খনন করা হয়েছিল সেখের দীঘি। বহরমপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে আছে লালদীঘি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বহরমপুর পৌরসভা লালদিঘীর নাম বদলে 'সুভাষ সরোবর' করেছে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সংলগ্ন এলাকায় তৈরী হয় ক্যান্টনমেন্ট। শোনা যায় ক্যান্টনমেন্ট তৈরী করতে যে ইঁট লাগে তার মাটি কাটা হয়েছিল লালদীঘি থেকে। ক্যান্টনমেন্ট এলাকার নিকাশি জল পয়ঃপ্রণালী বাহিত হয়ে অন্তপয়ঃপ্রণালী দিয়ে এসে পড়ে লালদীঘিতে এবং লালদীঘির বর্ধিত জল পয়ঃপ্রণালী বাহিত হয়ে গিয়ে পড়ে ধোপঘাটিতে এবং সেখান থেকে যায় ভান্ডারদহে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি বিল ও জলাভূমি বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

হিজল ঃ মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে কান্দী মহকুমার অন্তর্গত হিজলের বিল । এই বিলের কিছুটা অংশ বহরমপুর মহকুমারও অন্তর্গত। হিজল বিল ও হিজল এলাকা প্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-এর কায়স্থ খন্ডে লেখা আছে ঃ

তাহার পশ্চিম বিল দৈর্ঘ দ্বিযোজন।
নদীর দুধারে বহু হিজলের বন।।
তেই তারে হিজল বুলায়ে সকলে।
ডিহি আমলাই ঐ হিজল উপরে।।

দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষীর সন্নিকটে থাকায় দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষীর জলে প্রায় সারা বছরই ভরে থাকে এই বিল। বর্ষায় এর বিস্তৃতি দাঁড়ায় ৫০ বর্গ মাইলেরও উপর। জল নেমে গেলে উর্বর পলি পড়া জমিতে নানা রকমের চাষ হয়ে থাকে। হিজল বর্তমানে মূলতঃ উচ্চ ফলনশীল ধানের জমি। বিস্তীর্ণ হিজলে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে হয় প্রচুর ধান। অন্য সময় থাকে অজস্র ঘাস। হিজল এলাকায় বড় গাছ নেই বললেই চলে। ঘন বর্ষায় হিজলের কোথাও কোথাও জলের গভীরতা ২০ ফুটেরও বেশী, তবে জলের গড় গভীরতা ৩/৪ ফুটের বেশী নয়। শীত পড়লে হিজলের জল শুকায়। সুতরাং হিজলে শীতের ফসলই বেশী হয়—গম, যব, তৈলবীজ, ডাল ইত্যাদি। আগে হিজলে ছিল জমিদারদের বড় বড় জমি বা ঘের যা মাটির বাঁধ দিয়ে আলাদা করা হ'ত। এখন অনেক জমি ছোট ছোট দাগে বিভক্ত হয়েছে। জমির মালিকেরা জমির আলে ঘের বা মাটির বাঁধ দিয়ে অপরের জমি থেকে নিজের জমি আলাদা করেন বা জল আটকান। ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকা বাহিত হয়ে হিজলে এসে পড়ে স্যাঁতসেতে জলাভূমিতে হয় এমন অসংখ্য ছোট ছোট গাছের বীজ। সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের সঙ্গে ঐ গাছের তুলনা করা যায়। ঐ গাছগুলির নাম হিজল গাছ আর ঐ গাছের নাম থেকেই জলাভূমিটির নাম হয়েছে হিজল। হিজল গাছ হিজল এলাকা ছাড়া মুর্শিদাবাদের অন্য কোথাও এমন প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায় না।

গোবরানালা ঃ গোবরানালা মূলতঃ ভাগীরথীর একটি খাত, যা উৎসস্থল থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে বালিগ্রামের কাছে জলঙ্গী নদীতে মিশেছে। ভাগীরথীর পূর্ব দিকের এই শাখা নদী বহুযুগ আগে ভাগীরথীর উদ্বৃত্ত জলের চাপে তৈরী হয়ে ছিল। গোবরানালার উৎপত্তি ললিতাকুড়ি ও কালুখালির কাছ থেকে। ভাগীরথীর উদ্বৃত্ত জল পূর্বদিকে উপচে পড়ে। একে নিয়ন্ত্রিত করতে জিয়াগঞ্জ থেকে কালুখালি হয়ে ভগবানগোলা পর্যন্ত ললিতাকুড়ির বাঁধ দেওয়া হয়েছিল ভাগীরথীর পূর্বতীরে। ললিতাকুড়ির বাঁধ বন্যায় বারবার ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ইংরেজ আমলে ললিতাকুড়ির কাছে বসানো হয়েছিল স্লুইস গেট এবং ভাগীরথীর বামতীর বরাবর ললিতাকুড়ি থেকে পলাশী পর্যন্ত ৯০ কিলোমিটার পুরাতন জমিদারী বাঁধ সংস্কার করে তৈরী করা হয়েছিল ৯৪ নম্বর রিটার্যাড বাঁধ। বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল গোবরানালার উৎসমুখ। অন্যদিকে পদ্মার একটি খাল দীঘার প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে পাটন মৌজায় ভগবানগোলার আটমুখো সাঁকো হয়ে মিশেছে গোবরানালার সঙ্গে। আটমুখো সাঁকো হয়ে পদ্মার কিছু জল ও স্থানীয় পয়ঃপ্রণালীর জল এসে পড়ে গোবরানালায়। বর্ষার জলও গোবরা অববাহিকার বেশ কিছু বিলে জমে থাকে।

গোবরানালা বহরমপুর সদর মহকুমার যে অঞ্চল দিয়ে বাহিত সেই অঞ্চলের অববাহিকা বিস্তীর্ণ ও গভীর হলেও লালবাগ মহকুমায় এর বিস্তৃতি ও গভীরতা কম। কোথাও কোথাও গোবরানালা শুধুমাত্র নিম্ন জলাভূমি।

ভাগীরথীর বাঁধ থেকে জলঙ্গী নদী পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ এই নদীসদৃশ জলাভূমি তার অববাহিকায় অঞ্চল বিশেষে আটটি ভিন্ন নামে পরিচিত। গোবরানালার উত্তরাংশকে অর্থাৎ ভাগীরথীর বাঁধে জলাভূমির উৎসমুখ থেকে দীঘা পর্যন্ত অংশকে গোবরানালা বা গোবরা বিল এবং সবশেষের সুতী নদী বাদে আগের আট মাইল অংশকে ভান্ডারদহ বিল বলা হয়।

১) গোবরানালার উৎস মুখ থেকে দীঘা পর্যন্ত তিন মাইল অংশ গোবরানালা ।দীঘা বিলের উৎসমুখের স্লুইস গেটকে কাজে লাগিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ দীঘা প্রকল্প স্থাপন করে চিংড়ী ও মৎস চাষের ব্যবস্থা করেছেন। ২) দীঘা থেকে মুরাদপুর পর্যন্ত পাঁচ মাইল দীর্ঘ অংশের নাম দীঘা বিল। ৩) মুরাদপুর থেকে গৌরীবাগ ঘাট পর্যন্ত বিলটির নাম তোপখানা বিল। সজ্জি কাটরা মৌজায় তোপখানা বিলের পশ্চিম পাড়ে কাটরা মসজিদ এবং জাহানকোষা কামান অবস্থিত। গৌরীবাগ ঘাটের উপর পূর্বে ছিল একটি বাঁশের সেতু। কয়েক বছর পূর্বে সেখানে তৈরী হয়েছে পাকা সেতু। ৪) গৌরীবাগের ঘাট থেকে ভৈরবপুরের ঘাট পর্যন্ত ছয় মাইল অংশ খানা বা মথুরাপুরের বিল বলে পরিচিত। ৫) ভৈরবপুরের ঘাট থেকে আকন্দবেরিয়া ঘাট পর্যন্ত ছয় মাইলের নাম বালি বিল। বালি বিলের উপর পূর্বে ছিল পূর্ত বিভাগের বিরাট বিরাট ড্রামের উপর ঝুলন্ত কাঠের সেতু। কয়েক বছর পূর্বে ঐ কাঠের সেতু সরিয়ে পাকা সেতু তৈরী হয়েছে। বালির বিলে প্রচুর খয়রা মাছ উৎপন্ন হয়। বালি বিলের গভীরতা কোথাও ৫০/৬০ ফুট কোথাও ৮০ ফুট। বালি বিল থেকেই কালান্তরের নিম্ন জলাভূমির শুরু। ৬) আকন্দবেরিয়া ঘাট থেকে পাঁচবেরিয়া ঘাট পর্যন্ত সাত মাইল এলাকাকে খরিয়া বিল বলে। এই খরিয়া বিলও কালান্তর নামক নিম্ন জলাভূমির অন্তর্গত। ৭) পাঁচবেরিয়া থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত আট মাইল এলাকা ভান্ডারদহ বিল নামে পরিচিত। যদিও গোবরানালার সম্পূর্ণ অববাহিকাকে বা অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত আটটি বিলকেই ভান্ডারদহ বিল বলা হয়। ভান্ডারদহ বিলের পাড়ে রয়েছে বিখ্যাত বিন্দুবাসিনী মন্দির। ৮) চাঁদপুর থেকে জলঙ্গী নদীর মোহনা পর্যন্ত ১০ মাইল এলাকা সুতী নদী নামে পরিচিত। সুতী নদীর বামতীরে জলঙ্গী নদীর সঙ্গে সঙ্গমস্থলে গ্রামটির নাম টুঙ্গী। টুঙ্গী নওদা থানায় অবস্থিত । টুঙ্গী গ্রামে বিখ্যাত রাম সীতা ও জগন্নাথের মন্দির অবস্থিত।

ভান্ডারদহ বিল থেকে সারা জেলায় মাছের যোগান যায়। এটি কয়েকটি স্লুইস গেট দ্বারা ভাগীরথীর সাথে যুক্ত। খাগড়া বহরমপুরের স্লুইসের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর বিল থেকে ভান্ডারদহে জল আসে। খরিয়া ঘাটের সাথে যোগ সেচ ও জলপথ দপ্তরের নিকাশি নালার মাধ্যমে। দক্ষিণ দিকের নিকাশি নালার মাধ্যমে চালতিয়া, চাঁদা আর বোয়ালিয়া বিল হয়ে গোরাবাজার ও কৃষ্ণমাটির স্লুইসের মাধ্যমে ভাগীরথীর সাথে ভান্ডারদহ বিলের যোগ। স্থানীয় বৃষ্টির জল এবং অনেক ছোট ছোট 'দাড়া' বা নালার জলেও ভান্ডারদহ পুষ্ট হয়।

ললিতাকুড়ির বাঁধ পেরিয়ে ললিতাকুড়ি গ্রামের দিকে ভান্ডারদহ বিলের প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ একটি অংশ আছে। এর নাম বড় ঠাকুর বিল। বাঁধ দিয়ে আলাদা করে দেওয়ার আগে তা ভান্ডারদহ বিলের অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল।

বশিয়ারবিল ঃ নবগ্রামের থানার পাঁচগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিলবশিয়া । মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচ গ্রাম থেকে নবগ্রামের গুড়াপশলা এবং উস্তিয়া থেকে মোরগ্রাম পর্যন্ত পরিধি প্রায় ১৫ কিলোমিটার। বশিয়ার বিলের পাড়ে রয়েছে ৩০/৩২ টি গ্রাম। বর্ষার সময় থেকে কয়েক মাস জল থাকে এই বিলে। তারপর হয় উচ্চফলনশীল শস্যের চাষ।

পাটন বিল ঃ খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত এই বিলের আয়তন প্রায় তিন হাজার বিঘা। পদ্মপুরাণে পাটনের বিলের উল্লেখ আছে। ১৯৯৩ সালে গোকর্ণে যে বিধ্বংসী টর্ণেডো হয় ঐ টর্ণেডোর উৎপত্তি স্থল খড়গ্রামের পাটনের বিল বলে ভূবিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন।

বালোলের বিল ঃ খড়গ্রাম থানার অধীন ইদ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত সাদোল, শঙ্করপুর ও জয়পুর অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বালোলের বিল। ব্রাহ্মণী নদীর জলেই এই বিল পুষ্ট হয়।

মুন্ডমালা ঃ বড়ঞা থানার কাছে শালিকা ডাকবাংলোর দক্ষিণ-পূর্বের নিম্ন জলাভূমির নাম মুন্ডমালা।

দামোস ঃ ভগবানগোলার কাছে পদ্মার বিভিন্ন খালের নাম দামোস। ইলসামারী, কালীকূপ, মহিষডোবা, বাঁশলোই, ব্যাংমারী, ট্যাংরামারী প্রভৃতি অসংখ্য নামে দামোসের জলাভূমি রয়েছে।

তেলকার বিল ঃ ভাগীরথীর পশ্চিমে খাগড়াঘাট রেলওয়ে স্টেশনের নীচ থেকে তিন মাইল লম্বা এবং পৌনে তিন মাইল বিস্তৃত বিলটির নাম তেলকার বিল। ১৯৬৯-৭০ সালেও এর আয়তন ছিল ১১০০০ বিঘার বেশী। এখন এই বিলের অনেকটা ভরাট হয়ে গেছে ও চাষবাস শুরু হচ্ছে। প্রতিবছর কিছু জমি পুনরুদ্ধার হলেও বিলের জল নিকাশের সুব্যবস্থা হয় নি। প্রায় ৫০ বছর আগে একটি খাল কেটে সেচ বিভাগ জল নিকাশের চেষ্টা

করেছিল। কিন্তু তার ফল বিপরীত হয়েছিল। বর্ষায় স্ফীত ভাগীরথীর জল এই খাল দিয়ে তেলকার বিলে ঢুকত।

মতিঝিল ঃ ভাগীরথীর দিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল অ(্ধেখুরাকৃতি মতিঝিল । মুর্শিদাবাদ শহর থেকে দুই মাইল দ(িণ-পূর্বে এই বিল অবস্থিত। ঝিনুক চাষের জন্য এই বিলের নাম হয় মতিঝিল। বর্তমানে হয় মাছ ও প্রচুর পরিমাণে বোরো ধান। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সুবাদার আলীবর্দীর জামাতা ও ঢাকার নবার নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ অ(্ধেখুরাকৃতি ঐ ঝিলকে পরিখা হিসাবে ব্যবহার ক'রে নির্মাণ করেন প্রাসাদ ও মসজিদ।

আহিরণ বিল ঃ ১৯৭৪ সালে ফরাক্কা থেকে ফিডার ক্যানেল কেটে সুতীর সঙ্গে যোগ করলে নতুন যে প্রবাহ হয়, ঐ প্রবাহের জল বাড়লে তা ছড়িয়ে পড়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পশ্চিমে সাঁজুরমোড় থেকে বংশবাটী পর্যন্ত । মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় চাঁদেরবিল, বড়োলবিল, কেদানবিল ও চঁপরেরবিল। প্রায় তিন হাজার একর জমি আহিরণের ফিডার ক্যানেলের জলে জলমগ্ন থাকে। ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পূর্বে ঐ নিম্ন জলাভূমি ভয়াবহ ছিল না।

কাটিগঙ্গা নিম্ন জলাভূমি ঃ ফরাক্কার কাছে মুর্শিদাবাদে ঢোকার পর ভাগীরথী পলাশী পর্যন্ত অসংখ্য বাঁক নিয়েছে। ভাগীরথীর গতি পরিবর্তনে বহু বাঁক বহু সময় পরিত্যক্ত(হয়েছে এবং পরিত্যক্ত(বাঁকগুলি পরিণত হয়েছে অ(্ধেখুরাকৃতি বিলে। বহরমপুর লালবাগ সড়কের পীর তলায় ভাগীরথী পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে কাশিমবাজার ঘুরে সৈদাবাদ ফরাসডাঙ্গার কাছে পশ্চিমদিকে বাহিত হয়ে আবার দ(িণ দিকে বাঁক নিয়েছিল। ঐ বাঁকের বামতীরে কাশিমবাজারে, কালিকাপুরে ও সৈদাবাদ এবং ঘাটবন্দরের কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ছিল ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসীদের কুঠি। ভাগীরথীর জলপ্রবাহ বাড়াতে ১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পীরতলা থেকে ফরাসডাঙ্গা পর্যন্ত সোজা করে কেটে দিলে পীরতলা থেকে মুরাগোয়ার হয়ে কাশিমবাজার ও ফরাসডাঙ্গা পর্যন্ত একটি বদ্ধ জলার সৃষ্টি হয়। ম্যালেরিয়া ও ভয়াবহ মহামারীতে উজাড় হয়ে যায় সৈদাবাদ, কাশিমবাজার ও ফরাসডাঙ্গার জনপদ। ঐ বিস্তীর্ণ জলাভূমি কাটিগঙ্গা নামে পরিচিত। শুখা মরশুমে প্রচুর পরিমাণে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ হয় এখানে।

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে অনেকগুলি ছোট ছোট নদী বা শাখা নদী ছিল। ঐ ছোট বা শাখা নদী গুলি মজে গিয়ে কোথাও কোথাও বিল বা জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ভাগীরথী ও ময়ূরা(ী, ভৈরব প্রভৃতি বড় নদীগুলি দিক পরিবর্তন করায় সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ছোট বড় বিলের। ডাকরা, মুণ্ডমালা, কলকলি, সান্তিরা, রামধীরা, দামোস- এসবই অতীতের ছোট নদীর শুষ্ক খাত। এছাড়া এককালে এ জেলাতে ট্যাঁংরামারী, কাকমারী, বাচামারী, নসী, বাঁকি, বাটরা, (ড্ডা প্রভৃতি আরও অনেক অখ্যাত নদী ছিল। এদের এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এদের গভীরতর অংশগুলি বিলে পরিণত হয়েছে।

বহরমপুর থানার অন্তর্গত চাঁদের বিল, চালতিয়া বিল, বিষু(পুরের বিল, চাতরার বিল, (্বেতাখাঁর বিল, কাটিগঙ্গার নিম্ন জলাভূমি, কুমীরদহ, গোলাহাট, ভাস্করদহ, ঝিনুকদহ, শঙ্কর বিল, নামো বিল, লালডেরি বিল উল্লেখযোগ্য।

বেলডাঙ্গা থানার ডুমনিদহ, রামপাড়া বিল, শিয়ালমারী বিল, পাট বিল, সুজাপুর বিল, সেনদুরী বিল উল্লেখযোগ্য।

কান্দী থানার চরখা বিল, সেমিয়া বিল, ছোটবেলুন বিল, গোবরা বিল, কালিদহ বিল, গাংলা বিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খড়গ্রাম থানার শেরপুরবিল, শিয়ালমারী বিল, জিওলমারী বিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও খড়গ্রামের পাটন, সাকো রা , নয়ডাবিল বিখ্যাত।

ভরতপুর থানার লোহাদহ, বিধুপাড়া, শেরপুর উল্লেখযোগ্য। হিজলের বিরাট অংশ এই থানার মধ্যে পড়ে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার জামিওর, একুম্বা ,পা(লিয়া ,পাথরবিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফরাক্কা বাঁধের জলে বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে।

ডোমকল থানার জিওলমারী, জামনগর, বোরা, দুধসর প্রভৃতি বিল উল্লেখযোগ্য।

জলঙ্গী ও ডোমকল মিলে যে বড় বিল রয়েছে তার আয়তন প্রায় ৫ হাজার বিঘা । কাঁকড়াজোল ২৫০০ বিঘা, দুধসর বিল প্রায় ৪০০০ বিঘা, রমনা বিল প্রায় ৭০০০ বিঘা এবং তেলকার বিলের পরিমাণ প্রায় ১১০০০ বিঘা।

ভূমি(য়ের এলাকা ও কারণ

আবহবিকার দ্রবণ, ঘর্ষণ, ভাঙন প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদ্ধতির দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মাটি বা পাথরের স্থানান্তরকে ভূমি(য় বলে। খাদ্য ও কৃষি সংগঠন ভূমি(য়ের কারণ রূপে যে উপাদানগুলিকে চিহি(ত করেছে সেগুলি হলো মৃত্তিকার (য় প্রবণতা, ঢালের দৈর্ঘ্য, ভূমি ঢালের কৌণিক মান, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তীব্রতা ও শক্তি(ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমি(য়ের কারণ হিসাবে বৃষ্টিপাত, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যাবলী ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। মুর্শিদাবাদের ভূমি(য় মূলতঃ ভাঙনের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। আবার ভাঙন বলতে এখানে নদী পার (য়কে বোঝানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিভাগ বিস্তৃত সমতল প্রকৃতির। সমভূমি অঞ্চলে নদী আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার

. নদীসমূহও আঁকা-বাঁকা পথে প্রবাহিত হচ্ছে এবং এই আঁকা-বাঁকা খাতের ভিতর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ার সময়ে অবতল বাঁকে নদীস্রোত সরাসরি আঘাত করে। ফলে অবতল বাঁকে ভাঙন ধরে এবং উত্তল বাঁকে চর সৃষ্টি হয়।

নদীখাতের ভিতরে ঘূর্ণীস্রোত বা হেলিক্যাল ফ্লো-এর প্রভাবে নদীর অবতল বাঁকের তলদেশ (য় হয়। ফলে নদীর পাড় ভেঙে পড়ে।

নদীর অবতল বাঁকের নীচে ছোট ঘূর্ণীর জন্য (য় হয়। ফলে পাড়ের নীচে গর্তের উপরে নদীর পাড় বেশী(ণ ঝুলে থাকতে পারে না। তাই ভেঙে পড়ে। এভাবে নদীর পাড় ভাঙে।

মুর্শিদাবাদে জলস্তরের ওঠানামা নদীপাড় (য়ের একটি বড় কারণ। মুর্শিদাবাদ জেলায় বৃষ্টিপাত সারাবছরে একরকম হয় না। বৃষ্টিহীন মাসগুলোতে জলস্তর নেমে যায়। বর্ষায় নদীগুলো আবার জলে ভরে যায়। কখনো দু'কূল ভাসায়। বর্ষায় যখন ভরা নদী, সে সময় পাড় ভাঙার সম্ভাবনা কম। সে সময় নদীর জল ভূমির মধ্যে ঢুকে যায়। মৃত্তিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে চাপ সৃষ্টি হয়। নদীর জল নেমে গেলে নদী পাড়ের জমিতে প্রবেশ করা জলের চাপে পাড়ের মৃত্তিকা ঠেলে বেরিয়ে আসে। এই ধরনের প্রক্রি(য়ার মাধ্যমে ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত গঙ্গার গতিপথের ডান পাড় ভাঙছে। কারণ এই অংশে প্রায় দশ মিটার উঁচু খাড়া পাড়ের পলিস্তর ল(্য করলে দেখা যায় উপরের দু'মিটার হল কাদামাটির স্তর।

এই স্তর যথেষ্ট জমাটবদ্ধ। কিন্তু এর নীচে রয়েছে মাইকা মিশ্রিত সাদা বালির স্তর। এই স্তর ভঙ্গুর। জুন মাস থেকে গঙ্গার জল বাড়তে শু(করলে এই স্তরটি বেশীমাত্রায় ভাঙতে শু(করে। সমতল বাঁকগুলোতে জলের প্রবল আঘাতে ঐ বালির স্তর দ্রুত (য়ে যায়। নীচের বালি সরে যায়, নদীর পাড় বরাবর দেখা দেয় দীর্ঘ ফাটল এবং বিস্তীর্ণ এলাকা তার ফলে ভেঙে পড়ে। নদী যখন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, তখন প্রচুর জল পাড়ের বালির ভিতর ঢুকে যায়।

অক্টোবর মাসে নদীতে জল কমতে শু(করলে ঐ জল আবার নদীতে ফিরে আসে। এই প্রত্যাবর্তনের সময়েও প্রচুর বালি সরে গিয়ে গহ্বর সৃষ্টি হয় এবং উপরের পাড় ভেঙে পড়ে।

নদীর গতিপথের ঢাল, মৃত্তিকা স্তরের অবস্থান, ঘনত্ব ও মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রতা প্রভৃতির বিচার করে ডঃ এম. কে. দাস ও পি. কে. পাড়ু য়া বলেছেন, জঙ্গীপুরের ডানপাড়, পলাশী ও বহরমপুরের মাঝামাঝি অঞ্চল, মহ্যমপুরের বাঁ-তীর (য়প্রবণ।

তবে মুর্শিদাবাদের প্রধান ভাঙন প্রবণ অঞ্চল মূলতঃ ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ১০২ কিমি. গতিপথের গঙ্গার ডানপাড়।

মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙনের পটভূমিকার কথা জানতে হলে অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

১৮৫৮ সালে শেরউইল-এ রিপোর্টে জানা যায়, মানুষ তার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে বালুচরে ঘর বাঁধে, কৃষিজমি তৈরী করে। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বড় গ্রাম গড়ে ওঠে। দশ বারো বছর ধরে জমির খাজনা সংগৃহীত হয়। তারপর এক বর্ষায় সেই গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদে সুতি ছিল একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। ১৮৫৬ সালে গঙ্গার ভাঙনে ওই বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রায় অর্ধেক নিশ্চিহ্(হয়ে যায়।

১৮৭৬ সালে হান্টার সাহেব ' এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' নবম খন্ড, গ্রন্থে মুর্শিদাবাদের ভাঙন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ' বর্ষা ঋতুতে মাত্র আধ ঘন্টায় এক একর জমি জলের স্রোতে ভেসে যায়।' এই জেলার ভাঙনের মূল উৎস হ'ল গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী, জলঙ্গী ও ছোট ছোট নদী সমূহের উদ্বৃত্ত জলের দ্বারা অববাহিকা অঞ্চলের প্-াবন। প্-াবনের ফলেই ভাঙনের সৃষ্টি এই মুর্শিদাবাদ জেলাতে।

১০২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র চোল যখন বঙ্গদেশ জয় করেন তখন পদ্মাকে একটি খালের সাথে তুলনা করা হ'ত। তার পরবর্তী যুগে পদ্মা শীর্ণকায়া ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পদ্মা কৃত্তিবাসের লেখনীতে বড় গঙ্গা বলে অভিহিত ছিল। আজ থেকে ৫৯৩ বছর আগে অর্থাৎ ১৫০৭ সালে শ্রীচৈতন্য পূর্ববঙ্গে এই পদ্মায় তীর্থস্নান করেছিলেন।

১৫৯৬ সালে আবুল ফজল নাম করেছেন পদ্মার। ১৬৬০-৬৬ সালে ফার্ণ ডেন ব্রোক ও রেনেলের নকশায় পদ্মা বেগবতী নদী হিসাবে বর্ণিত আছে।

কিন্তু পরবর্তী সাড়ে চারশো-পাঁচশো বছরের মধ্যে ঐ খালরূপী পদ্মা ভয়ঙ্কর ভাবে 'কীর্তিনাশা পদ্মা' রূপে মুর্শিদাবাদে আবির্ভূত হয়েছে। বছরের পর বছর পদ্মা ধীরে ধীরে শহর, গ্রাম, বসত, চাষ জমি অবলীলায় গ্রাস করছে।

এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় যে, স্বাধীনতার পর মুর্শিদাবাদের ভৌগোলিক রূপটির বদল ঘটে। একদিকে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে উদ্বাস্তুদের আগমন এই দুই -এর প্রভাবে দিয়ার অঞ্চলের জনসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা তীরের ১১টি ব্লকে ১৭ ল(র বেশী মানুষ বসবাস করেন। নদীর তীরে গড়ে উঠেছে শহর, নগর, পাকা বাড়ী, রেলপথ, সড়কপথ। ফলে ভাঙনে এসবও (তিগ্রস্থ হচ্ছে এবং তার পরিমাণ আগের তুলনায় বেশী।

সময়ের সাথে সাথে ভাঙনের কেন্দ্রস্থলটি বারে বারে বদলে গেছে। গঙ্গার তীর্যক স্রোত ফরাক্কা ব্যারেজের ডানদিকের ৫৪টি

গেট দিয়ে নির্গত হয়ে নয়নসুখ, সাঁকোপাড়া, ধুলিয়ান অঞ্চলে আঘাত করে। এই অঞ্চলের ভাঙন শু(হয়েছিল ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরী হওয়ার আগে থেকেই।

১৯৪২-১৯৫৮ সালের মধ্যে গঙ্গার ভাঙনে বারহাড়োয়া আজিমগঞ্জ কাটোয়া ১৩ কিমি. লাইনের রেলপথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে নিমতিতা থেকে সাঁকোপাড়া পর্যন্ত রেলপথ নতুন করে তৈরী হয়। আহিরণ থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত ৩৪ নং জাতীয় সড়কের অংশটি সরিয়ে নেওয়া হয় আরো পশ্চিমে। ধুলিয়ান শহরটি অন্ততঃ চারবার ভেঙে যাওয়ার পর প্রায় ২ কিমি. পশ্চিমে নতুন করে গড়ে উঠেছে।

১৯৮০ সালে সাঁকোপাড়ায় নতুন রেলপথের সঙ্গে গঙ্গার দূরত্ব ছিল ৫১৮ মিটার। বর্তমানে ঐ দূরত্ব আরও কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৬৫ মিটার। ১৯২৫, ১৯৭৪ এবং ১৯৯৫ সালের ম্যাপ ও উপগ্রহ চিত্র তুলনা করলে, নয়নসুখ থেকে আহিরণ পর্যন্ত ৩০ কিমি. পথে রেলপথ ও গঙ্গার ত্র(মহ্রাসমান দূরত্বের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

রেলপথ ও গঙ্গার ত্র(মহ্রাসমান দূরত্ব (কিমি.)

স্থানের নাম	সাল		
	১৯২৫	১৯৭৪	১৯৯৫
নয়নসুখ	৫.১২	২.৫০	১.৩০
সাঁকোপাড়া	৪.০০	০.৫৫	০.১৬৫
ধুলিয়ান	৭.৫২	২.৫০	২.৪০
নিমতিতা	৪.৮০	৩.০০	১.৮৪
সুতি	৪.৪৮	২.৯০	১.৭৩
সুজনিপাড়া	৬.৭২	৪.০০	২.৮৮
আহিরণ	৫.৬০	৪.৮০	৩.৩৪

১৯৮০ -র দশকে ধুলিয়ান অঞ্চলে ভাঙনের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু গিরিয়া, খেজুরতলা, মিঠিপুর, শেখালিপুর, ফাজিলপুর ইত্যাদি স্থানে শু(হয় ব্যাপক ভাঙন। পুনের গবেষণাগারের পরী(ায় দেখা গেছে গঙ্গায় জলপ্রবাহের মাত্রা ১০ ল(কিউসেক -এর বেশী হলে ভাঙন শু(হয়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ১৫ ল(কিউসেক জল প্রবাহিত হয় বলেই এই অঞ্চলে এত ভাঙন।

১৯৭৬ সালে ফাজিলপুরের কাছে গঙ্গা আর ভাগীরথীর মধ্যে দূরত্ব ছিল ২.৮৬ কিমি.। ১৯৯৬ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১.৪০ কিমি.। ১৯৯৯ সালে তা আরও কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১.৩৪ কিমি.। বস্তুতপ(পৃথিবীর ইতিহাসে কোন প্রধান নদী শাখা নদীতে মেশেনি। গঙ্গা-ভাগীরথী যদি মিশে যায় তবে তা হবে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তবে আশার কথা গত কয়েক বছর এই দূরত্ব স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে।

১৯৭৬ সালে আখেরীগঞ্জ থেকে গঙ্গার দূরত্ব ছিল প্রায় ৮ কিলোমিটার। ১৯৮৮, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে এই অঞ্চলে ভাঙন ল(্য করা যায়। ভগবানগোলা ও রাণীনগর থানার হনুমন্তপুর, টিকলিচর, চরকেষ্টপুর, চিলমারী, হাসানপুর, গিরিধারীপুর, রাজাপুর ইত্যাদি বহু গ্রাম নিশ্চিহ্(হয়ে যায়। আখেরীগঞ্জের ভাঙন কিছুটা কমে যাবার পর ১৯৯৮ সালে জলঙ্গী শহরটি আত্র(ান্ত হয়।

জনাকীর্ণ জলঙ্গী বাজার এলাকাটির প্রায় অর্ধেক এবং করিমপুরগামী ১১ নং রাজ্য সড়কের কিছুটা গ্রাস করে নেয়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাঙনের এলাকাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মূলতঃ প্'াবনই ভাঙন বা মৃত্তিকা (য়কে ত্র(মশঃ বাড়িয়ে তোলে। আর এই ভাঙনের ফলে মূল যে সমস্যা তা হল গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাওয়া। গ্রাম ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে গ্রামের সমস্ত সম্পদ ধ্বংস হয়। স্কুলবাড়ি, কাঁচা-রাস্তা, পাকা-রাস্তা সবই নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কত শত শত মানুষের প্রাণ অকালে চলে যায়। একটা অঞ্চলের জনজীবন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সেই বাস্তুতন্ত্রেরও খানিকটা বিঘ্ন ঘটে। অঞ্চলটির জলনির্গম ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার (্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। ২০০০ সালের বন্যার ফলে কালুখালি অঞ্চলে যে বিশাল অংশের ভাঙন হল, তার ফলে সেই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত এই ২১ বছর পদ্মা মুর্শিদাবাদের কত হে র জমি গ্রাস করেছে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল—

সাল	ভাঙনের পরিমাণ (হে র)
১৯৭৮	৩৫৯
১৯৭৯	১২৪
১৯৮০	১০০
১৯৮১	৭৯
১৯৮২	৮৯
১৯৮৩	১০৩
১৯৮৪	৬৩৫
১৯৮৫	২৪২
১৯৮৬	১৭৮

সাল	ভাঙনের পরিমাণ (হে র)
১৯৮৭	১০৬
১৯৮৮	২৫৩
১৯৮৯	১৭৩
১৯৯০	২৬০
১৯৯১	১৬১
১৯৯২	১১৪
১৯৯৩	২৭১
১৯৯৪	৩৭৫
১৯৯৫	৩২৪
১৯৯৬	২৬৫
১৯৯৭	১৬৯
১৯৯৮	১৮১

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে গত ২১ বছরে মুর্শিদাবাদে ৪৫৬১ হে র জমির (য়প্রাপ্তি ঘটেছে পদ্মার করাল গ্রাসে। অন্যদিকে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৪৬ বছরে জেলায় ভাঙন হয়েছে ২৬ হাজার ৭৬৯ হে র জমি। অর্থাৎ বছরে ৫৮১ হে র জমির (য়প্রাপ্তি হয়েছে। কিন্তু গত ২০ বছরের হিসাব ধরলে বছরে জমির (য়প্রাপ্তি ঘটেছে ২১৭ হে র। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে বর্তমানের থেকে অতীতে ভাঙনের পরিমাণ আড়াই গুণ বেশী।

পলি সঞ্চয়

মুর্শিদাবাদের ভাঙনের সাথেই জড়িয়ে আছে পলি জমার ইতিহাস। কেননা কোথাও ভাঙছে মানে সেই ভাঙনের অংশ কোথাও গিয়ে জমেছে। মুর্শিদাবাদের নদীগুলোর খাতে পলি জমছে বিভিন্ন কারণে।

নদী বিশেষজ্ঞরা বলেন, নদীর স্রোত যদি বয়ে আনা মাটির নীচে থিতিয়ে যায়, নদীর মুখ বন্ধ থাকলে উজানে সবকটি নদীর গতি স্বভাবতঃই ম্লান হয়ে আসে। শুধু তাই নয়, ব্যাপক হারে বৃ(ছেদন ও নদীর তীরে বসতি গড়ে তোলার জন্য গাছকাটা, এমন কি ঘাস, কাশ প্রভৃতি বন নষ্ট করে ফেলার ফলে স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশী মাটি জলের সঙ্গে নেমে আসে। এই সমস্ত মাটি নদীর খাতে জমে জমে খাতকে সমতলভূমিতে পরিণত করে। ফলে বর্ষার সময় সব উপনদীর জল নামতে না পারায় উজানে জমতে শু(করে। এবং অগভীর নদীর খাত থেকে আশপাশ অঞ্চলে জল ছড়াতে থাকে। বাঁধগুলির রিজার্ভারের তলা অনেক আগেই ভরে যাওয়ার ফলে নদীগুলোর জল ধারণের (মতা কমে আসে। শাখানদী গুলো যা বছরের অন্যান্য সময় জলহীনতায় শুকিয়ে মজে থাকে, তারাও বর্ষায় পূর্ণবেগে আসা জলধারায় প্লাবিত হয়, ভূমি(য় করে। আর এই জন্যই ফরাক্কার ঠিক দ(ণে মুর্শিদাবাদ ভারতের মানচিত্র থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে।

সমগ্র মুর্শিদাবাদ জুড়ে প্রবাহিত গঙ্গা ও ভাগীরথী নদী খাত তার অববাহিকার অঞ্চলে নরম মৃত্তিকাকে গ্রাস করে বা জলবাহিত পলি দ্বারা ত্র(মশ ভরাট হয়ে পড়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ‘গঙ্গা রিভার ইরোশন কমিটি’ -কে দেওয়া স্পেশাল ওয়াটার এন্ড পাওয়ার রিসার্চ স্টেশনের ১৯৭৯ সালের ব্যাকগ্রাউন্ড নোট থেকে জানা যায় ‘গঙ্গার শিল্টচার্জ খুব কম, ১.৪ গ্রাম/লিটার যার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই হচ্ছে ধুয়ে আসা পলি’, তাই গতিপথের সংলগ্ন অঞ্চলের অবিরাম ভাঙন-ই এই জেলার নদীগুলোর মজে যাওয়ার মূল কারণ। এই রিসার্চ স্টেশনের লিখিত মন্তব্য থেকেই জানা যায়, গঙ্গা নদীর তলদেশ ও পাড়ের মাটি আঠাহীন, বালুকা যুক্ত((কিন্তু পার্শ্বদেশ বা পাড় ঢালু থাকায় জলস্রোতকে সে তলদেশের মতো শূণ্য করতে পারে না এবং সহজেই ধ্বসে যায়। এভাবেই পার্শ্বস্থ ভাঙনের ফলে নদী ত্র(মশ অগভীর হয়ে ওঠে।

তাছাড়া ভাগীরথীর-নাব্যতা হ্রাসের বা নদীতে পলি সঞ্চয়ের কয়েকটি কারণ আছে। যেমন -

১। উজান থেকে আসা জলের স্থায়িত্ব ও পরিমাণের স্বল্পতা — বছরে কেবল ৫ মাস, জুনের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত জল থাকে। ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরী হবার আগে ঐ ৫ মাস জল পাওয়া যেত গড়ে ৭৫ থেকে ৮০ হাজার কিউসেক। আর বাকি ৭ মাসের কোন কোন সময় এই সরবরাহ শূণ্যে নেমে যেত। এখন অবস্থার উন্নতি হলেও তা নদীর অবনতি রোধে যথেষ্ট নয়।

২। বিপরীত দিক থেকে সমুদ্রোৎসারিত জোয়ারের জলের অবারিত অনুপ্রবেশ।

৩। পলি ভারের পরিমাণ ও প্রকৃতি।

এর যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে নদীর বিদ্যমান সাম্যাবস্থার হানি হয়। আর পরিবর্তন ত্র(মাগত হতে থাকলে নদী কখনও সুস্থিত হবার অবকাশ পায় না। হুগলী নদীর (ে ত্রে তিনটি নিয়ামক কারণ-ই ত্র(মাগত বদলাচ্ছে। ফলে তার আচরণে অসাম্য ও অস্থিরতা থেকেই যাচ্ছে।

জোয়ারের জলস্ফীতি কোন দিনই এক থাকে না। মরাকোটালে-তেজকোটালে, পূর্ণিমায়-অমাবস্যায় জলস্তর বাড়ছে কমছে প্রতিদিনই বিরামহীন ভাবে।

গঙ্গা দুভাগ হওয়ার পর ভাগীরথীর প্রথম শাখানদী বাঁশলোই

ও পাগলা। এই দুই শাখানদী ভাগীরথীকে যা জল দেয় তা সামান্যই। এর পরের শাখানদীগুলি (দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, মোর ও কোপাই) হিজল বিল হয়ে ভাগীরথীতে মিলিত হবার ফলে উজানের জলের সরবরাহ তেমন বাড়তে পারে না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মার্চ থেকে মে এই তিনটি মাস হ'ল সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ। জোয়ারের প্রাবল্য নির্ভর করে পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য ও চন্দ্রের আপে(িক অবস্থানের উপর। ফেব্রুয়ারী থেকে জোয়ার ত্র(মশ বাড়তে বাড়তে মে মাসে প্রবলতম হয়। এই সময়ে পলি সঞ্চয় হয় সবচেয়ে বেশী। তাই এই সময় ৪০ হাজার কিউসেক জল উজান থেকে না এলে এই উপচীয়মান পলির অপসারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বর্ষার সময় ৪০হাজার কিউসেক পেয়ে বিশেষ লাভ নেই। কারণ মার্চ থেকে মে - এই তিন মাসের পলি সঞ্চয়কে রোধ করতে গেলে দরকার জোয়ার ও ভাঁটার প্রাবল্যের মধ্যে সমতা আনা এবং সেটা সম্ভব তখনই, যখন উজান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ (ন্যূনতম ৪০ হাজার কিউসেক) জল পাওয়া যাবে। বর্ষার সময় উজান থেকে আসা জলের পরিমাণ বেশি হওয়া সত্বেও ঐ তিন মাসের সঞ্চিত পলি অপসারিত হয় না। মার্চের মতো সেপ্টেম্বরেও জোয়ারের জোর বাড়ে, কিন্তু সে সময় উজান থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পাওয়া যায় বলে পলি সঞ্চয়ের তেমন অবকাশ ঘটে না।

ফরাক্কা থেকে প্রায় ৪০ কিমি. দ(িণ পূর্বে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার নুরপুর গ্রামে গঙ্গা নদী ভাগীরথী ও পদ্মা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত(হয়েছে। পদ্মা মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর সীমান্ত ধরে প্রায় ৬০ কিমি. পথ অতিত্র(ম করে জলঙ্গীর পরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে, আর ীণকায় ধারাটি ভাগীরথী নামে দ(িণ দিকে প্রায় ৫০০ কিমি. পথ অতিত্র(ম করে সাগরে পড়েছে। ভাগীরথী নদী উৎসমুখে বছরে ন' মাস গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কারণ শুখা মরসুমে গঙ্গার জল ভাগীরথীর গর্ভ থেকে এক মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে গঙ্গার জল ভাগীরথীতে প্রবেশ করে না বরং ভূগর্ভের জলস্তর থেকে যে সামান্য জল ভাগীরথীর সাথে সঞ্চিত হয় তা বিপরীতমুখী গতিতে গঙ্গার দিকে প্রবাহিত হয়। গত দুই শতাব্দী ধরে ভাগীরথীর উৎসমুখটি বারে বারে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই উৎসমুখের বিবরণ ফরাসী পরিব্রাজক ট্যাভারনিয়ারের একটি চিঠিতে আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে যে সব বিদেশী ভ্রমণকারী বাংলাদেশে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই গঙ্গা-ভাগীরথীর নাব্যতা সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন। সকলেই বলেছেন, ভাগীরথীর বুক জুড়ে বালির বড় বড় চর জেগে ওঠার ফলে তাঁদের নৌকা ছেড়ে দিতে হয়।

১৬৬৬ সালে ৬ই জানুয়ারী ট্যাভারনিয়ার তাঁর চিঠিতে বার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে গঙ্গার বুকে বড় বড় বালির চরের কথা বলেছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরে   র স্যার উইলিয়াম হেজেস ১৬৮৩ সালে কাশিমবাজারে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, বালির চর থাকার জন্যে তাঁর বজরা মন্থুলাতে আটকে যায় এবং তাঁকে পালকি চেপে কাশিমবাজারে যেতে হয়েছিল। তখন ভাগীরথীর নাম উজানে ছিল কাশিমবাজার নদী আর ভাটিতে তার নাম হয়েছিল হুগলী নদী। কর্ণেল রেনেল সাহেব ১৭৮১ সালে লিখেছেন যে কাশিমবাজার নদীতে অ   াবর থেকে মে মাস পর্যন্ত নৌকা চলাচলের মত জল থাকে না।

১৭৯৭ সালে ক্যাপ্টেন কোলব্রুক বহরমপুরে এসেছিলেন। তিনিও লিখেছেন গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদী দিয়ে নৌকা চলে না। নদীর সর্বত্র বালির চর পড়ায় ভাগীরথী অগভীর ও শীর্ণকায়া। ১৮০১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত কোলব্রুকের একটি লেখা থেকে জানা যায় যে সেই সময় ভাগীরথী নদী দুটি স্থানে গঙ্গার সাথে যুক্ত(ছিল। প্রথম সংযোগটি ছিল ফরাক্কার কাছে মোহনগঞ্জে, আর দ্বিতীয়টি ছিল সুতিতে। ১৮২৪ সালে ভাগীরথীর মূল উৎসটি ছিল সুতি থেকে প্রায় ২২ কিমি. উত্তর-পশ্চিমে ফরাক্কার কাছে। কিন্তু ১৮২৫ সালে ফরাক্কার দ(িণে গঙ্গা গতি পরিবর্তন করে প্রায় ১১ কিমি. দ(িণ-পশ্চিমে সরে আসে এবং ভাগীরথীর গতিপথের কিছু অংশ গ্রাস করে নেয়। ফলে ১২ কিমি. দ(িণ-পূর্বে চোখায় একটি নতুন উৎস সৃষ্টি হয়।

ক্ট

১৮৭১ সালে বন্যার সময় সুতি থেকে প্রায় ১০ কিমি. দ(িণ-পূর্বে চৌরাশিয়ায় ভাগীরথীর একটি নতুন মুখ খুলে যায়। কিন্তু ১৮৮১ সালের মার্চ মাসে এই উৎসটি পলি পড়ে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বিভিন্ন জরিপের সময় সংগৃহীত তথ্যগুলি একত্রিত করে ১৯২৫ সালে ভারতীয় জরিপ বিভাগ কতগুলি ভূমিরূপ মানচিত্র প্রকাশ করে। সেই মানচিত্রে দেখা যায় ভাগীরথী তখন তিনটি স্থানে গঙ্গার সাথে যুক্ত(ছিল। প্রথমটি নয়নসুখে, দ্বিতীয়টি সুতিতে এবং তৃতীয়টি গিরিয়াতে। সেই সময় নয়নসুখ থেকে গিরিয়া পর্যন্ত গঙ্গা ও ভাগীরথী পাশাপাশি প্রবাহিত হত এবং দুটি নদীর মাঝে প্রায় ৭৭ বর্গকিমি. বিস্তৃত চর ছিল।

৫০ বছর আগেও মুর্শিদাবাদ জেলাতে ছোট ছোট নদী অনেক ছিল। তার বেশীর ভাগই এখন চাষের জমি। গোবরানালা বা ব্রাহ্মণীর আর সে অবস্থা নেই। বর্ষাকালে নদী দুটির অস্তিত্ব বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সান্তিরা, রামধীরা, মুন্ডমালা, ডাকরা, দামোস, কলকলি প্রভৃতি নামেমাত্র টিকে আছে। এককালে এই জেলাতে

ট্যাংরামারী, কাকমারী, বাচামারী, নসী, বাটরা, (ড্ডা প্রভৃতি ছোট ছোট অখ্যাত নদী ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমল থেকেই এসব নদীর নাব্যতা হারিয়ে যায়। ধীরে ধীরে সেখানে চাষের জমি গড়ে ওঠে। বড় বড় জলাধার নির্মাণ পলি জমার একটি অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হয়। বাঁধ দেওয়ায় নদী তার স্বাভাবিক ধারা হারিয়ে চড়ায় পরিণত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এরূপ বাঁধের সংখ্যা কম নয়। সব থেকে বড় যে বাঁধ তার নাম অ্যাফ্লেকস্ বাঁধ। বাঁধটি গঙ্গা-পদ্মার পাড় বরাবর এবং জঙ্গীপুর লালগোলা স্টেট হাইওয়ের সমান্তরাল ১৬ কিমি. লম্বা এবং ময়াগ্রামের হাইওয়ের কাছে এটি শেষ হয়েছে। এই অ্যাফ্লেকস্ বাঁধটি ছাড়াও রয়েছে আরও কয়েকটি বাঁধ। যেমন মোল্লাডাঙ্গা বাঁধ, শোনেপুর বাঁধ, ইসলামপুর বাঁধ, শিশাপাড়া বাঁধ, চক হরহরিয়া বাঁধ, ফতেপুর বাঁধ, স্বরূপপুর বাঁধ, পদ্মনাভপুর বাঁধ, জিৎপুর বাঁধ, রণগ্রাম বাঁধ, মহম্মদপুর বাঁধ ইত্যাদি।

এই সকল বাঁধের উপরে অনেক স্থানেই মানুষ বসবাস করছে। বাঁধের মাটি কাটছে। ফলে বাঁধ পড়ছে দুর্বল হয়ে। বর্ষা এলেই বাঁধের মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। জমা হচ্ছে নদীখাতে। নদী অগভীর হয়ে পড়ছে , নাব্যতা হারাচ্ছে। নদীতে পলি জমার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রথম সমস্যা হল প্লাবনের সৃষ্টি। কেননা নদী গর্ভে পলি জমলে তা উঁচু হয়ে যায়, ফলে নদী নাব্যতা হারায়। বর্ষাকালে বর্ষণের জল সেই নদীখাত বহন করতে পারে না। দু'কূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত ঃ নদীখাতের মাঝখানে চর জেগে উঠলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। তৃতীয়ত ঃ নদী নৌ-পরিবহনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। চতুর্থত ঃ সমগ্র জেলার জলনিকাশ ব্যবস্থা (তিগ্রস্থ হয়। পঞ্চমত ঃ মুর্শিদাবাদের অনেক নদী হারিয়ে গেছে নদীখাতে পলি জমার ফলে।

নদীতে পলি জমার ফলে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় তার সমাধানের জন্য যে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যেতে পারে তার মধ্যে প্রধান হ'ল মজা-নদীকে পুন(দ্ধার করা। সেই সকল প্রশস্ততর নদ-নদীকে অপে(াকৃত সংকীর্ণ ও গভীর করে নিয়ে নাব্য প্রণালী বৃদ্ধির মাধ্যমে নদীতে পলি জমার সমাধান করা যেতে পারে।

এছাড়া আরও কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। সমগ্র জেলায় যে অসংখ্য ঘের বাঁধ রয়েছে সেগুলো ভেঙে দেওয়া দরকার। নদীর চলার পথের যাবতীয় বাধা তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

খাল ও বিল সমূহের সময়োপযোগী সংস্কার জ(রী। নদীখাতের গভীরতা বাড়াতে হবে। বাঁধগুলো উঁচু করা দরকার। বিশেষজ্ঞের অনুমোদন ছাড়া নতুন রাস্তা, রেললাইন বা কোনরকম সেতু তৈরী করা উচিৎ নয়, কারণ পরিকল্পনাবিহীন রাস্তা এবং প্রচুর থামওয়ালা সেতুগুলো জলের স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে দেয়।

উদ্ভিদ ও বনসম্পদ

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ সম্পদে মুর্শিদাবাদ জেলা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। মূলতঃ পদ্মা-গঙ্গার পলি দিয়ে এ জেলার ভূখন্ড তৈরী হওয়ায় এই জেলার মাটি খুবই উর্বর। উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং অনুকূল আবহাওয়ার কল্যাণে এখানে স্বাভাবিক উদ্ভিদের প্রাচুর্য বিশেষভাবে ল(ণীয়। ঋতুচক্রে(র ছয়টি ঋতুই এখানে কমবেশী দৃশ্যমান। ফলে সূর্যালোক, উষ(তা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতার হেরফেরে ঋতুভেদেও জেলায় প্রচুর নতুন নতুন গাছপালা জন্মাতে দেখা যায়। উদ্ভিদ ও বন-সম্পদে এ জেলার বৈচিত্র তাই যথেষ্ট বেশী। বৃহত্তর (ে ত্রের আলোচনায় মুর্শিদাবাদ জেলার গাছপালাকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় পর্ণমোচী (Tropical Deciduous) উদ্ভিদ বলে ধরা হলেও এখানে প্রচুর পরিমাণে চিরহরিৎ বৃ(রাজিও রয়েছে।[১]

প্রাকৃতিক উদ্ভিদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হলেও এইসব গাছপালার প্রকৃতি এবং পরিমাণ সর্বত্র সুষম নয়। একটু গভীরভাবে পর্যবে(ণ করলে সেই পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রাকৃতিকভাবে মুর্শিদাবাদ জেলা রাঢ় ও বাগড়ী এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত(। ভাগীরথী নদীর পশ্চিমদিকের অংশ রাঢ় এবং পূর্বদিকের অংশ বাগড়ী অঞ্চল নামে পরিচিত।

রাঢ় অঞ্চলের মাটি দেখতে লাল রঙের(এই ধরনের মাটিতে কাঁকড়ের পরিমাণ বেশী থাকে।[২] মাটিতে চুন ও লোহার - এর প্রাধান্য থাকায় এ মাটি বাগড়ী এলাকার মাটি থেকে সম্পূর্ণ অক্সাইড রূপেই আলাদা। বাগড়ী এলাকার মাটি প্রধানত দোঁয়াশ প্রকৃতির। বেলে মাটি এবং এঁটেল মাটিও বিরল নয়। স্থান ভেদে মাটিতে বালির পরিমাণ কমবেশি হতে দেখা যায়। কাজেই মাটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অঞ্চলভেদে স্বাভাবিক উদ্ভিদও যে পরিবর্তিত হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

তবে একই সাথে এ কথাও অনস্বীকার্য যে মুর্শিদাবাদে প্রাপ্তব্য সমস্ত উদ্ভিদই জেলার সর্বত্রই কমবেশী দেখা যায়। সূক্ষ্ম যে তফাৎ, তা রয়েছে তাদের বিন্যাস ও ঘনত্বে। স্বাভাবিক উদ্ভিদের সংখ্যা, বিন্যাস আর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে মুর্শিদাবাদের সমগ্র ভূখন্ডকে তিনটি উদ্ভিদ অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

ক) রাঢ়ের তাল প্রধান উদ্ভিদ অঞ্চল

খ) বাগড়ীর ফলদায়ী উদ্ভিদ প্রধান অঞ্চল ও

গ) হিজল সংলগ্ন সোয়াম্পি(Swampy) উদ্ভিদ অঞ্চল।

ক) রাঢ়ের তাল প্রধান উদ্ভিদ অঞ্চল ঃ-

তাল গাছের (*Borassus flabellifer* L.) আধিক্য এই উদ্ভিদ অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাল ছাড়াও অন্যান্য যে সব গাছপালা এখানে দেখা যায় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল মহুয়া

(*Madhuca logifolia Koenig.*), শিরিষ (*Albizia lebbeck (L.) Benth.*), তেঁতুল(*Tamarindus indica L.*), অর্জুন(*Terminalia arjuna* Roxb. ex DC), বহেড়া(*T. bellirica (Gaertn.)* Roxb.) কাঠবাদাম(*T. catappa* L.), গাব(*Diospyros malabarica* Deser, Kostel.) ইত্যাদি।

খ) বাগড়ীর ফলদায়ী উদ্ভিদ প্রধান অঞ্চল ঃ-

বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছের উপস্থিতি এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমের জন্য এই অঞ্চলটি সুবিখ্যাত। আমের (*Mangifera indica* Linn.) প্রচুর প্রজাতি এখানে দেখা যায় যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কোহিতুর, বোম্বাই, বীরা, জাহানকোষা, শাদুল্লা, বেগম-পসন্দ, রানী-পসন্দ, আনারস, চাঁপা, ল্যাংড়া, মোলামজাম, ফজলি, সিন্দুরে, চন্দনকোষা, কোহিনুর, গোপালভোগ, ভবানী, গন্ধরাজ, কাঁচামিঠে, হাঁতিশুড়ে, ল(ণভোগ ইত্যাদি। এছাড়াও অন্য যে সমস্ত ফলের গাছ এখানে দেখা যায় তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) লিচু (*Litchi chinensis* Sonn.), বেল (*Aegle marmelos (*L.) corr.), কামরাঙা (*Averrhoa carambola* L.), পেয়ারা (*Psidium guava* L.), জাম(ল (*Syzygium samarangense* Blume, Merrill & Perry), কালোজাম (*S. cumini* L.), বনজাম (*S. Fruticosum* Dc.), পেঁপে (*Carica papaya* L.), কলা (*Musa paradisiaaca* L.), খেজুর (*Phoenix sylvestris* Roxb.),নারকেল(*Cocos nucifera* L.), আতা (*Anona squamosa* Linn.), নোনা (*Anona retuculata* Linn.) ইত্যাদি।

গ) হিজল সংলগ্ন সোয়াম্পি (Swampy) উদ্ভিদ অঞ্চল ঃ-

একদা হিজল অঞ্চলে হিজল গাছের (*Barringtonia acutangula* (L.) Gaerth.) বিশেষ প্রাধান্য ছিল। সম্ভবত মোর এবং দ্বারকা নদী বাহিত হয়ে হিজলের বীজ এই স্থানে এসে পৌঁছত[৩]। নীচু ভূমিভাগে ঐ বীজগুলি জমে একসময় ঐ অঞ্চলে হিজলের জঙ্গল সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে অবশ্য খুব বেশী হিজল গাছ এ এলাকায় দেখা যায় না। নীচু জলাজমি ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখন এ অঞ্চলে প্রায় সারা বৎসরই চাষাবাদ হয়ে থাকে ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদের ধরণও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ অঞ্চলে যে সব উদ্ভিদের প্রাধান্য দেখা যায় সেগুলি হল দাদমারি (*Ammnia baccifera* L.), ব্রাহ্মী (*Bacopa monieri* (L.) Pennell.), মনোচোরিয়া (*Monochoria* sp.), হোগলা (*Typha angustata* Bory & Chaub.), হাইড্রিলা (*Hydrilla* sp.), শালুক (*Nymphaea* sp.), পানিফল (*Trapa bispinosa* L.), পদ্ম (*Nelumbo nucifera* Gaerth.), কলমী (*Ipomoea aquatica* Forsskal), ছাতিম (*Alstonia scholaris* (L.) R. Br.), বেরেলা (*Sida* sp.), খসখস (*Vetiveria izanioides* L.), ঘেঁটু (*Clerodendron viscosum Vent.*), নিশিন্দা (*Vitex negundo* L.) ইত্যাদি।

তবে একই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে বেশ কিছু উদ্ভিদ অঞ্চল নিরপে(ভাবে সারা জেলা জুড়েই দেখা যায়। রাস্তার ধারের এ রকম সাধারণ উদ্ভিদ হল বট (*Ficus benghalensis* L.), অ(শ্বথ(*F. religiosa* L.), শিমূল (*Bombax ceiba* L.), বকুল (*Mimusops elengi* L.), নিম (*Azadirachta indica* Juss.), পরেশ পিপুল (*Thespesia populnea* L. Sol.), বাবলা (*Acacia nilotica* (L.) Del.), শিশু (*Dalbergia sisso* Roxb), কদম (*Anthocephalus cadamba* (Roxb.) Miq.), কৃষ(চূড়া (*Caesalpinia pulcherima* Sw.), রাধাচূড়া (*Delonix regia* Raf.), বকফুল (*Sesbania grandiflora* Pers.), ইউক্যালিপটাস (*Eucalyptus citriodora* Hook.), গুলমোহর (*Poinciana regia* Boj.), মেহগনি (*Swietenia mahagoni* (L) Jacq.), সুবাবুল (*Leucaena glavea* Benth.), কাঞ্চন (*Bauhinia purpurea* Linn.), আকাশমণি (*Acacia auriculoformis* A. Cunn.), বিলাতি শিরিষ (*Samanea saman* Jacq. Merr.), পাকুড় (*Ficus infectonia* Roxb.) ইত্যাদি।

জেলার প্রায় সর্বত্রই যে সমস্ত আগাছা দেখা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে দূর্বা (*Cynodon dactylon* Pers.) কুশ (*Eragrostis cynosuroides* Link.), চোরকাঁটা (*Chrysopogon aciculatus* Trin.), নলখাগড়া (*Fragmites karaka* Trin.), ঘৃতকুমারী (*Aloe vera* L.), শতমূলী (*Asparagus racemosus* Wild.), সর্বজয়া (*Canna indica* Linn), রক্ত(দ্রোণ (*Leonurss sibiricus* L.), তুলসী(*Ocimum sanctum* L.), বাবুই তুলসী (*O.basilicum* L.), সন্ধ্যামণি (*Mirabilis jalapa* L.), মণীন্দ্রকাঁটা (*Lantana camara* L. var *aculeata Moldenke.*), দুরন্ত (*Duranta repens* L.), বাসক (*Adhatoda vasica* Nees.), আম(ল (*Oxalis corniculata* L.), মুথাঘাস (*Cyperus sp.*), কালকাসিন্দা (*Casia sophera* L.), মুক্ত(ঝুরি (*Acalypha indica* Linn.), (দিওকরা (*Chrozophora rottleri Klotz.*), লালপাতা (*Euphorbia pulcherrima* Willd.), ভুঁই আমলা (*Phyllanthus fraternus* Webs.), বন ওকরা (*Urna lobata* Linn.), আকন্দ

(*Calotropis procera* R. Br.), দুধিলতা (*Pergularia daemia* Chois), অনন্তমূল (*Hemidesmus indicus* R. Br.), কাঁটানটে (*Amaranthus spinosus* L.), কুচিলা (*Strychnos nux-vomica* L.), লজ্জাবতী (*Mimosa pudica* L.), হাতীশূঁড় (*Heliotropium* indicum L.), কালমেঘ (*Andrographis paniculata* (Burm f.) Wall ex Nees.), কেশরাজ (*Wedelia chinensis* (Osbeck) Meer.), বনওকরা (*Xanthium indicum* Koenig.), লুচিপাতা (*Peperomia pellucida* (L) Kunth.), পিপুল (*Piper longum* L.), পিটালি (*Trewia nudiflora* L.), বিছুটি (*Tragia involucrata* L.), রেড়ী (*Ricinus communis* L.), গীমা (*Centaurium centaurioides* (Roxb) Rao and Hemadri.), দুধকলমী (*Operculina turpenthum* (L) S. Manso.), দুধিলতা (*Ichnocarpus frutescens* (L) R.Br.), করবী (*Nerium indicum* Mill.), ভূতকাঠি (*Croton bonplandianus* Baill.), সর্পগন্ধা (*Rauvolfia sp.*), তেলাকুচা (*Coccinia grandis* (L) Voigt.), গুলঞ্চ (*Tinospora cordifolia* (Willd) Miers.), গোয়ালীলতা (*Cayratia pedata* (Lam) Juss ex Gagnep.), ইত্যাদি।

সৌন্দর্যবর্দ্ধক গাছ হিসাবে বেশ কিছু গাছ জেলাঞ্চলে লাগানো হয়ে থাকে, এদের মধ্যে রয়েছে দেবদা((*Polyalthia longifolia* (sonn) Thw.), চাঁপা (*Michelia champaka* L.), কাঁঠালীচাঁপা (*Artabotrsys uncinatus* (Lamk.) Mec.), স্থলপদ্ম (*Hibicus mutabilis* L.), জবা (*H. rosa sinensis* L.), শিউলি (*Nyctanthes arbor-tristis* L.), গন্ধরাজ (*Gardenia florida* Willd.), কামিনী (*Murraya paniculata* (L.)Jacq.), রঙ্গন (*Ixora sp.*), বেলফুল (*Jasminum sambae* Ait.), টগর (*Ervatamia divaricata* (L) Burk.), নাগলিঙ্গম (*Couroupita guianensis* Aubl.), বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপ (*Rose centifolia* L. etc.), বাগানবিলাস (*Bougainvilea spectabilis* Willd.) ইত্যাদি। এসব ছাড়া মরসুমী ফুলের জন্য এ জেলায় ব্যাপক হারে গাঁদা, ডালিয়া, জিনিয়া, চন্দ্রমল্লিকার চাষও হতে দেখা যায়।

কৃষিজ ফসল হিসাবে এ জেলায় চাষ করা হয় এমন উদ্ভিদের সংখ্যাও কম নয়। ধান (*Oryza sativa* Linn.), গম (*Triticum aestivum* Linn.), এ জেলার প্রধান খাদ্যশস্য। কোথাও কোথাও ভুট্টার (*Zea mays* Linn.), চাষও হয়ে থাকে। বার্লির (*Hordeum vulgare* L.) চাষও খুব বিরল নয়। তন্তু উৎপাদনকারী উদ্ভিদ হিসাবে পাটের (*Corchorus olitorium* Linn., *C.capsularis* Linn.) ব্যাপক চাষের পাশাপাশি শন (*Crotalaria juncea* L.) এবং মেস্তা (*Hibiscus cannabinus*) চাষও হয়ে থাকে। ডাল শস্যের মধ্যে মুসুর (*Lens esculenta* Moen.), ছোলা (*Cicer arietinum* L.),মুগ (*Phaseolus radiatus* L.), মটর (*Pisum sativum* L.), খেসারি (*Lathyrus sativus* L.), অড়হর (*Cajanus cajan* (L) Mill.), প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তৈলবীজ হিসাবে চাষ হয় সরিষা (*Brassica nigra koch, B. Junecea Hook f. et Thom, B. campestris L. Vr. sarson* Pro.), তিসি(*Linum usitatissimum* L.) ও তিল (*Sesamum indicum* L.) এর, শর্করা উৎপাদক হিসাবে চাষ হয় আখ (*Saccharum officinarum* Linn.) এবং খেজুরের (*Phoenix slyvestris* Roxb.)। সবজি হিসাবে চাষ হয় আলু (*Solanum tuberosum* L.), বেগুন (*Solanum melongena* L.), পটল (*Trichosanthes dioica* Roxb.), কুমড়ো (*Cucurbita maxima* Duch.), লাউ (*Benincasa cerifera* Savi.), শশা (*Cucumis sativus* L.), পুঁই (*Basella rubra* L.), টম্যাটো (*Lycopersicon esculentum* Mill.), মূলা (*Raphanus sativus* L.), গাজর (*Daucus carota* L.), বীট (*Bita vulgaris* L.), ফুলকপি, বাঁধাকপি (*Brassica oleracea* L.-র বিভিন্ন প্রজাতি), লঙ্কা (*Capsiscum frutesecns* Linn.), পেঁয়াজ (*Allium cepa* Linn.), রসুন (*A. sativum* L.) প্রভৃতি, মশলার জন্য চাষ করা হয় জিরা (*Carum carvi* Linn.), ধনে
ক্স (*Coriandum sativum* Linn.), মৌরী (*Foeniculum vulgare Gaertn.*), আদা (*Zingiber officinale* Rose.), হলুদ (*Curcuma longa* Linn.) প্রভৃতির। এসব ছাড়াও এ জেলায় বাণিজ্যিকভাবে বাঁশের (*Bambusa tulda* Roxb.) ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। এসব উদ্ভিদের পাশাপাশি জেলায় প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের শৈবাল পাওয়া যায়। মস ও ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদও এখানে বিরল নয়। জেলার খালবিল পুকুর ডোবা ও জলাজমিতে কারা (*Chara sp.*), প্রোটোকক্কাস (*Protococcus sp.*), ক্ল্যামাইডোমোনাস (*Chlamydomonas sp.*), ভলভক্স (*Volvox sp.*), ওডোগোনিয়াম (*Oedogonuum sp.*), ইউলোথ্রি (*Ulothrix sp.*),অসিলেটোরিয়া(*Oscillatoria sp.*), নস্টক (*Nostoc sp.*), অ্যানাবিনা (*Anabaena sp.*), প্রভৃতি শৈবালের বিশেষ প্রাচুর্য ল(্য করা যায়। এক কথায় বলতে ফিওফাইসী ও রোডোফাইসী শ্রেণীর শৈবালসমূহ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর শৈবালই এখানে প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়।

মস জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে রিকসিয়া (*Riccia sp*), বারবুলা (*Barbula sp.*) ইত্যাদি বেশ সুলভ। ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে

টেরিস (*Pteris longifolia*) খুবই সহজ লভ্য। বিস্ময়করভাবে এখানে পাওয়া যায় ইকুইজিটাম (*Equisetum sp.*) - এর প্রজাতি যা মূলত পাহাড়ী অঞ্চলের উদ্ভিদ। জেলায় 'সাতনলা' নামে পরিচিত এই উদ্ভিটির যে সমস্ত প্রজাতিগুলি এখানে পাওয়া যায় তাদের জনন প্রত্রি(য়া(ম অংশটুকু (Strobilus) খুবই ছোট হতে দেখা যায়। সম্ভবত জেলার আবহাওয়ার কারণেই এই পরিবর্তন হয়ে থাকে। এহেন বৈচিত্রের সমাবেশে মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্ভিদ সম্পদ তাই সর্বার্থেই অনন্য।

জেলায় প্রাপ্ত উদ্ভিদের বিশেষ আর্থিক ও সামাজিক ব্যবহার

কাঠ হিসাবে আসবাবপত্র তৈরীর কাজে বা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের বাইরেও জেলায় প্রাপ্ত কিছু উদ্ভিদের বিশেষ সামাজিক ব্যবহার ল(ণীয়। যুগ যুগান্ত ধরে এই সমস্ত উদ্ভিদের পরম্পরাগত ব্যবহার রীতিমতো কৌতুহলকর। যেমন বেলপাতা, তুলসীপাতা আর দূর্বাঘাস জেলার হিন্দুসম্প্রদায়ের পূজার উপাচার। নিত্যপূজার প্রয়োজনে ফুলের যোগান পেতে বাড়ীর আশে পাশে টগর, নয়নতারা, গাঁদা, বেলী বা জবাগাছ লাগানো হিন্দুদের প্রায় অবশ্য কর্মের সামিল। মঙ্গলানুষ্ঠানে কলাগাছের অনুসঙ্গ অবিচ্ছেদ্য। দেবদা(পাতা, আমপাতা বা বেলপাতা দিয়ে মন্ডপ সাজানোর ঐতিহ্য গ্রামের দিকে এখনো পুরো মাত্রায় চালু আছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে টুথব্রাশ এখন অপরিচিত না হলেও গ্রামের লোকেদের অনেকেই এখনও নির্ভর করে নিম, পিটুলী ও খেজুর ডালের দাঁতনের উপর।

অলঙ্কার পরার প্রয়োজনে নাক ও কান ফোঁড়ানোর পর যাতে সেই ফুটো আবার বন্ধ হয়ে না যায় সেজন্য ব্যবহার করা হয় নিমকাঠি। গ্রামের মানুষজন এখনও বৃহৎ ভোজকাজে বাজার থেকে কেনা শালপাতা বা ক্যাটারারদের ফাইবার প্'েটের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করেন পদ্মপাতা বা কলাপাতার উপর। শহর বা মফস্বলের অনেক দোকানেও লুচি বা কচুরি পরিবেশিত হয় পদ্মপাতায়।

আর্থিক দিকে থেকে অনগ্রসর কিছু মানুষ বিশেষ নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে শুকনো কলাপাতা পুড়িয়ে সেই ছাই দাঁত মাজার গুল তৈরীর কারখানায় চালান দেন।

পতিত জমির অভাবে খড়ের চাষ কমে যাওয়ায় অনেকের ঘরের চালেই এখন পাটকাঠির আচ্ছাদন, কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয় তালপাতাও। সব্জি বা ফসলের (ে তকে গবাদি পশুর হাত থেকে র(া করতে এমন কি আব(র(ায়ও ইঁটের প্রাচীরের পরিবর্তে পাটকাঠির বেড়ার ব্যবহার ব্যাপক। বিদ্যুৎ নেই এমন এলাকায় এখনও গরমের হাত থেকে বাঁচতে তালপাতার পাখাই ভরসা। তালপাতা দিয়ে তৈরী হয় বসবার আসনও। খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী হয় পাটি (এক ধরনের মাদুর)- এটি মরসুমি (বর্ষাকালীন) কুটীরশিল্প। নারকেল পাতা থেকে খিল সংগ্রহ করে তৈরী হয় ঝাঁটা। ডাল সহ খেজুর পাতাকে স(স(করে চিরেও তৈরী হয় ঝাঁটা। বেশ কিছু গ্রামীণ কারিগর ঝাঁটা - বাড়ুন তৈরী করেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। দরিদ্র মানুষেরা পেয়ারা পাতার এবং গাছের শুকনো ছাল পুড়িয়ে সেই ছাই দিয়ে দাঁত মাজেন। তাদের দাবি বাজার চলতি মাজনের চেয়ে গুণমানে কোনও অংশে কম নয় এই মাজন। ধনী-দ্‌রিদ্র নির্বিশেষে ধর্মবি(াসী হিন্দু মৃতের শ্রাদ্ধে পরম্পরা মেনে হাতে পরে কুশের আংটি। পুকুর পাড়ে বা নদীর ধারে পোতেন বেনা গাছ। তাল ও খেজুরের মিষ্টি রসকে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করেন অনেক মানুষ। কেউ কেউ এই সব রসকে গাঁজিয়ে উত্তেজক পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাছে উৎসব অনুষ্ঠানে গাঁজানো তাল/ খেজুরের রস বা মহুয়া এক অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ।

গ্রামীণ মানুষদের অনেকেই অল্প দামী চায়ের অনভিপ্রেত গন্ধ দূর করার জন্য চা তৈরির সময় তাতে মহুয়া ফুল দেন। এর ফলে চা-এর একটি অন্য রকমের ফ্লেভার আসে।

একেবারে হতদরিদ্র লোকেরা, যারা সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার কোন সুযোগ পান না তারা সন্তান জন্মের পর নাড়ী কাটার জন্য ব্যবহার করেন বাঁশের চাঁচড়ি (বাঁশ দিয়ে তৈরি তীক্ষ্ম ধার বিশিষ্ট ছুরি) - তথাকথিত অশি(ত ধাইরা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গেই এই চাঁচড়ি ব্যবহার করেন।

দুর্গাপুজোয় দশমীর যথাবিহিত পুজোর পর অপরাজিতা পুজো হয়ে থাকে। এরপর ধর্মবি(াসী লোকেরা সাদা অপরাজিতার লতা বাহুতে ধারণ করেন। লোকবি(াস আড়াই পাক বিশিষ্ট এই লতা ধারণ করলে শরীর সুস্থ থাকে, সুখ-সমৃদ্ধি আসে। অনেকে বি(াস করেন ঈশের মূল সাপ তাড়ায়। এই লোকবি(াসে বি(াসী লোকেরা হাতে তাবিজের মত করে ঈশের মূল ধারণ করে। কিছু লোক বি(াস করেন যে কোন দুষ্ট লোকের নজরে কারও কোন (ত, ফোড়া বা কাঁটাছেড়া পড়লে তারা মন্ত্র পড়ে (ত বিষিয়ে দিতে পারে - এই কুদৃষ্টি এড়ানোর জন্য এসব লোকেরা আকলতির লতাকে বালার মতো গোল করে পাকিয়ে হাতে পরে। লোকবি(াস এভাবে কুদৃষ্টিকে প্রতিহত করা যায়।

এসব ছাড়াও রয়েছে ঔষধ হিসাবে উদ্ভিদের ব্যবহার। গ্রামীণ মানুষদের বিশেষত আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কাছে এখনও আয়ুর্বেদের গু(ত্ব অসীম। এর প্রধান কারণ পাশ্চাত্য

চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং এর ব্যয়বাহুল্য। অপরপ(পরম্পরাগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে গ্রামীণ মানুষজনেরা সাধারণ অসুখ বিসুখে কবিরাজের কাছে না গিয়েই নিজেরা ওষধি নির্বাচন করতে পারেন - যাতে কোন খরচ নেই। এইসব ওষুধ একদিকে যেমন খাঁটি অন্যদিকে তেমনই সুলভ ও পার্শ্বপ্রতিত্রি(য়ার কথাও তেমন শোনা যায় না।

আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া বা গ্রামীণ মানুষদের কাছে তাই জেলার উদ্ভিদ সম্পদের এক অন্য গু(ত্ব রয়েছে। জেলার উদ্ভিদ সম্পদের আর্থিক বা সামাজিক ব্যবহার কোনটাই তাই উপে(ণীয় নয়।

সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় সরকারী বনবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জঙ্গল এলাকা মাত্র ৭৬৯.৮৪ হে র। এই সঙ্গে আছে ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলের ধারে ১৯৭৬-১৯৭৭ থেকে সৃজিত এবং নদীয়া-মুর্শিদাবাদ বিভাগের রঘুনাথগঞ্জ রেঞ্জের র(ণাবে(নে থাকা প্রায় ৬০০ হেক্টর আবাদী বন। মুর্শিদাবাদের নবাবদের যে সমস্ত নানা গাছের বাগান এলাকাগুলি আছে সেগুলি বর্তমানে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারও আয়তন প্রায় ২০০ হেক্টর হবে। এছাড়া আছে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের মাধ্যমে সৃজিত আবাদি সারিবদ্ধ বনগুলি যা খালের পাড়, রাস্তার ধার, বাঁধের পাড়, ইত্যাদি স্থানে সৃজন করা হয়েছে। ১৯৮০ সাল থেকে, সৃজন করা এই আবাদী বনের পরিমাণও প্রায় ২৫০০ হেক্টর। এর বাইরে আছে স্কুল, কলেজ, থানা, হাসপাতাল, পঞ্চায়েতের নিজস্ব জায়গাতে এবং মানুষের নিজস্ব জমিতে সৃজিত ফার্ম ফরেস্ট্রির গাছপালা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সবুজের আবরণ এই জেলাতে আশানুরূপ নাই। অথচ বৈজ্ঞানিক মতে সমগ্র ভূমির ৩৩ শতাংশ সবুজায়ন থাকা দরকার। বর্তমানে জেলাতে ১৩-১৪ শতাংশ বনভূমি আছে। এই ঘাটতি পূরণে সরকারী প্রশাসন, স্কুল, কলেজ, বেসরকারী সংস্থা, পঞ্চায়েত, সাধারণ মানুষ সবাইকে প্রতিনিয়ত মিলিত প্রয়াস চালাতে হবে সুস্থ পরিবেশ ফিরে পেতে, এর কোন বিকল্প নাই ।

আজকের দিনে, মুর্শিদাবাদ জেলায় গাছ লাগানোর পর তাকে র(া করার ব্যাপারটাই সবথেকে সমস্যাপূর্ণ। সামাজিক গণচেতনা ছাড়া এর মোকাবিলা করা খুবই কঠিন। ভয়াবহ বন্যার করাল থাবা থেকে জেলাবাসী অনেকাংশে র(া পেতে পারে, যদি যথেষ্ট সবুজের তথা গাছপালার আবরণ থাকে।

'কালুখালি' আমাদের সেই সুপ্ত চেতনাকে জাগাতে পেরেছে কিনা, ভবিষ্যৎই বলবে। নির্বিচারে গাছকাটা বন্ধ হওয়া অবশ্যই দরকার। সে সঙ্গে দরকার যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা করাত কলগুলির নিয়ন্ত্রণ। বছর চারেক আগের সরকারী হিসাব অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলায় প্ইউড ফ্যাক্টরী ও করাতকল আছে মোট ২০৯ টি যার মধ্যে বনবিভাগের লাইসেন্স প্রাপ্ত মিলের সংখ্যা মাত্র ৩০ টি। বাকী সবই লাইসেন্স ছাড়া এবং এই সংখ্যাটি ত্র(মশই বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে নির্বিচারে গাছ নিধন চলছে। এর সবটা অংশই মিলের যোগান দিচ্ছে। অরণ্য সংর(ণের কথা আমরা বলি কিন্তু অরণ্য সংর(ণ কেবল গাছ বাঁচিয়ে রাখাই নয়, প্রকৃত চাহিদা যাতে মেটানো যায়, সংর(ণের সেটাও একটা বড় দিক। নিয়মিত যোগানের ল(্যে বেশী বেশী করে গাছ লাগিয়ে ৩৩ শতাংশ পূরণ করা যেমন দরকার তেমনই সমপরিমানে দরকার অন্যান্য মানুষ সৃষ্ট ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী দমন করা।

গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকা দরকার। কেবলমাত্র তখনই এই জেলাকে নির্মল, সুস্থ সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে পারা যাবে। বর্তমান তাকিয়ে আছে সেই আগামী দিনের দিকে। কবে আসবে সেই দিন, কে বলতে পারে। এখন শুধু চেষ্টা করাই কাজ।

প্রাণীজগৎ

বর্তমান মুর্শিদাবাদে প্রাকৃতিক অরণ্য নেই বললেই চলে। ফলে মুর্শিদাবাদের বৃহদাকার বন্যপ্রাণীরা আজ সকলেই জেলা থেকে বিলুপ্ত। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। প্রাচীন মুর্শিদাবাদের জঙ্গল সমাকীর্ণ পরিবেশে একদিকে যেমন বাঘ, নেকড়ে, চিতা, গন্ডারের মতো বৃহদাকার বন্যপ্রাণীর আধিক্য ছিল তেমনি জলে ছিল কুমিরের
ক্ট রাজত্ব। ১৮০২ সালে লর্ড ভেলেন্সিয়ার এক লেখা থেকে জানা যায় যে, তখন কাশিমবাজারে বাঘের উপদ্রবে অস্থির হয়ে কোম্পানী প্রতি বাঘ বধের জন্য দশ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর শু(থেকেই জেলাঞ্চলে ব্যাপক নগরায়ণ প্রত্রি(য়া শু(হয়ে যাওয়ায় জেলার বনাঞ্চল ত্র(মশ কমতে থাকে। বন কেটে গড়ে ওঠে বসত। বনাঞ্চল কমতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমতে থাকে বন্য প্রাণীর সংখ্যা - বৃহদাকার বন্যপ্রাণীরা হারিয়ে যেতে থাকে জেলার মানচিত্র থেকে। ১৮৬০ সালেও জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে কখনও কখনও বাঘের দেখা মিলত। রেভিনিউ সার্ভেয়ার জে.ই. গ্যাসট্রেলের মতানুযায়ী সেগুলো সম্ভবত রাজমহলের বাঘ। চিতা, বুনো বেড়াল অবশ্য ছিল অনেক। জেলার উত্তর-প্রান্তে দেখা যেত গন্ডার।[২] বুনোশুয়োর ছিল অজস্র। বুনো মোষেরও দেখা পাওয়া যেত জেলায়। তবে একই সঙ্গে গ্যাসট্রেল এও জানিয়ে ছিলেন যে চাষাবাদের দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে বন্যপ্রাণীরা ত্র(মশ বিরল থেকে বিরলতর হয়ে উঠছে। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত পাঁচ বছরে জেলায় বন্যপ্রাণীর আত্র(মণে প্রতিবছর গড়ে ১৩জন করে মারা গেছিলেন। এই পাঁচ বছরে জেলায় সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটেছিল ২২২ জনের।[৩] বাস্তবিকই জলে